প্রেম, পরকীয়া: ফোকগানে কিছু নমুনা পরিমল রায়

পরিমল রায়
পড়াশোনা নৃবিজ্ঞানে যেখানে প্রবেশ এক নাটকীয়তার মাধ্যমে (দেখা যেতে পারে নৃবিজ্ঞানঃ পড়ার বোধ ও জানার দায়)। পরবর্তীতে এমবিএ আর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও অপরাধ বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে ৩টি কাগজ (সনদের চেয়ে কাগজ ঢের ভালো লাগে) অর্জন, মনের খোরাক মিটাতে। আপাতঃত বিদ্যাতয়নিক আগ্রহের জায়গা ডিকলোনিয়ালাইজেশন, নিম্নবর্গীয় স্বর, আর প্রান্তিক জনের মানুষরা। পেশাগতভাবনা ও বিকাশের অধিক্ষেত্র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড।যদিও কর্মসূত্রে নানান ঘাট-অঘাটের জল খেয়ে বর্তমানে থিতু আছেন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ।ভাবনার বিকেন্দ্রীকরন আর শিক্ষক পিতার বিদ্যোৎসাহই লেখার জগতে অশক্ত পা ফেলা।

এ লেখার ভাবনাটি যেভাবে এলো শুরুটা কিভাবে হবে? বাসায় রাধা কৃষ্ণের ছবি ঝুলানো। কারন, মধ্যবিত্তের গৃহবধুর গৃহসজ্জার অংশ হিসেবে ড্রইং রুমের এক কোনায় এতদসংক্রান্ত ছবির সংযোজন আমার মনের কোনে প্রশ্ন জমা হবে,এটাই স্বাভাবিক এ কারনে যে আমার বিদ্যায়তনিক জ্ঞানকাণ্ডটি তা করতে নিরন্তর প্রেরণা যোগায়। নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বলে সামগ্রিক অথবা হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহাসিক সর্ম্পকের অনুসন্ধান ও সমসাময়িককালের যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে এরকম একটি ছবির বিষয়বস্তু বা বস্তুনিষ্ট সর্ম্পকের অনুসন্ধান আমাকে প্রতিনিয়ত উদ্বেলিত করে। এ প্রেম নারীর জীবনে, রাধার জীবনে প্রভাব ফেলার পাশাপাশি বর্তমান সময়ে কিভাবে ব্যাখ্য করা যায় এ সর্ম্পকের গতি প্রকৃতি- এরকম খোরাক প্রস্তুতিতে, ভাবতেই গেলো অনেক, অনেক সময়। সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা, আইন, আর সমাজের চোখ কিভাবে দেখবে আমাকে বা বিষয়টাকে? প্রশ্ন তুলবে কেন, কিসের জন্য এ লেখা অবধারতিভাবে এরকম জিজ্ঞাসা আমাকে নিরন্তর ভাবিত করেছে? কিভাবে আর কি করে বুঝাবো যে, যা ভালো লাগে, তাই লিখি; যা ভালো লাগে তাই বলি। কিন্তু বাস্তবতা হলো-আমার ভালো লাগলেও, সমাজের চোখে তা ভালো নাও হতে পারে। এখানে থিসিস, এ্যান্টি থিসিস আছে সিনথেসিস, ইদানিং মেটাথিসিসের কথাও শুনছি।
শুরুতেই যে যুগল ছবির কথা বলছিলাম, তা এই মহাভারতেরই একটি অংশ হলেও এর অখণ্ড ভারতীয় সমাজে এর গভীরতা ও বিস্তার ব্যাপক। সম্পর্কটির আর্থ-সামাজিক ভিত্তিক গভীরতা অনেক, এবং যৌনতার

সম্পর্কে কিছুটা হলেও সম্পর্কিত বলাই যায়। যদিও কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন। বলে থাকেন জগতের প্রতি সৃষ্টিকর্তার আমোঘ সম্পর্ক ও নিয়তির কথা। তাই, এমন একটি সম্পর্ক অধ্যয়ন কিংবা পাঠকের সামনে উপস্থাপন সহজ বিষয় হয়ে উঠে না। তথাপি নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অংশ হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে যৌনতার ডিসকোর্সে সাধ্যমতো পুনঃপাঠ করা তো যেতেই পারে। পুনঃপাঠ বলছি এ কারনে যে, বিবাহ হলো যৌনতার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ছাড়পত্র (আহমেদ:২০০৯:২১)। এ ছাড়পত্রের আলোকে যৌনতা একটি অধীত ও বহুচর্চিত বিষয় এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা ও বই পত্রের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়। ভারতীয় মহাদেশে বাৎসায়নের ‘কামসূত্র’ উল্লেখযোগ্য একটি। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত যে সকল সম্পর্ক চিরায়ত ভাবে টিকে আছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা নৃবিজ্ঞান নামক কর্মকান্ডের আলোকে তেমন একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ককে লোকায়ত বা ফোকগানের ঢং উপস্থাপিত বর্ণনাসমূহকে সামগ্রিকভাবে একটি উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে নারী সমাজের অবস্থানের তুলনামূলকচিত্র ইতিঃপূর্বে উপস্থাপিত অন্যান্য লেখক ও গবেষকের আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ লেখা পুনরায় তুলে ধরা মাত্র। সেক্ষেত্রে এটা পুনঃপাঠ বৈকি? কিন্তু মুসকিল হলো লেখাটি পড়তে গিয়ে পাঠককে থমকে যেতে হয় প্রথমতঃ বিষয়বস্তু দেখে দ্বিতীয়তঃ পর্যালোকগণের মতে এটার অর্থ্যাৎ ”এই রচনাখানির প্রতি আমরা এত সময় বিনিয়োগ করেছি এর বিষয়বস্তু, ও রচয়িতার বাক্যগঠনে প্রায়শই “গাম্ভীর্যের” কারণে। খুব বেশি রচয়িতা বাক্যগঠনে এত নিবিষ্ট পাওয়া যায় না অধুনা।” সুতারাং চিন্তার দৈন্যতা নয় বরং উন্মুক্ত হোক এমন প্রত্যাশা আমার । এক্ষেত্রে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ফারাক যে বড্ড বেশী হবে না তা বলা যেতেই পারে।
এরকম একটি লেখা হাত দিতে গিয়ে প্রায়শঃই আমাকে মগ্ন থাকতে হয়েছে আপন ভূবনে, ফলে পরিবার আর দপ্তরের কাজকর্মে উদাসীনতা আসেনি জোর গলায় বলতে পারিনা। সবকিছু মিলিয়ে দর্শনের সেই উক্তি ” শেষ ভালে যার, সব ভালো তার” এমন প্রত্যাশায়, আমিও আশাবাদী।

ভূমিকা

নারীবাদী দর্শনের প্রচারমূলক কিংবা যৌনতা বিষয়ক গবেষণামূলক বিদ্যাজগতের পুরোপুরি বিদ্যাতয়নিক লেখা এটি নয়।বরং এক ধরনের বিশেষ সম্পর্ক বিশ্লেষনে হঠাৎ আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োগমাত্র। এ বিশ্লেষনে লোকায়ত বা ফোকগানের পাশাপাশি লোকশাস্ত্রের কতিপয় গানকে বেছে নেয়া হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এ সকল গানে প্রেম, যৌনতা কিংবা সম্পর্ক শব্দটি উভয় লিঙ্গের কাছে অর্থ্যাৎ নারী ও পুরুষের কাছে একই অর্থ বহন করে না। নারীর কাছে প্রেম কিংবা

ভালোবাসা তার সমগ্র অস্তিত্ব বলে প্রতীয়মান হলেও পুরুষের কাছে যৌনতা কেবলই পুনরৎপাদন কিংবা শরীরকেন্দ্রিক খেলা বলে বিবেচিত। এ আলোকেই রাধা-কৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমকে সামনে রেখে দেশীয় পরিসরে অন্যান্য লেখকের ন্যায় (আজাদ, চৌধুরী, নিউটন, কবীর, প্রমূখ) নারীর যৌনতাকে লোকশাস্ত্র তথা ফোকগানের বদৌলতে নারীর শরীর কিংবা শারীরবৃত্তীয় কলাসমূহকে দেখা, বুঝা এবং উপলব্ধির এক উপস্থাপনা মাত্র বলা যায়। বেভোয়ার (২০১২) কবি নিটশের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন- “প্রেম শব্দটি পুরুষ ও নারীর কাছে বোঝায় দু’টি ভিন্ন জিনিস। নারী প্রেম বলতে যা বোঝায় তা খুব স্পষ্ট এটা গভীর অনুরক্তি নয়, এটা দেহ ও আত্মার এক সামগ্রিক দান, যাতে নেই কোনো মনোভাব সংবরন, নেই অন্য কিছু বিচার বিবেচনা। নারীর প্রেমের এ শর্তহীন প্রকৃতি একে করে তোলে একটি ধর্ম বিশ্বাস, তার একমাত্র বিশ্বাস।” এ বিবেচনায় রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গঁ উৎকৃষ্ট উদাহরণ ও আমাদের যাপিত জীবনের নানান রকম সম্পর্কের অনুভূতি আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হয় সেই বিবেচনায় এ লেখার অবতারনা মাত্র।
এটা সত্য যে আমরা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক কর্পোরেট যুগের বাসিন্দা বা বাণিজ্যাকায়নের ক্রেতা। তাই পুজিঁর প্রসারের প্রক্রিয়ায় আমরা যারা পুরুষ, নারীর কাছে শতভাগ বিশুদ্ধতা কিংবা সততা চাই তারা নিজে কতোটা শুদ্ধ অথবা পরিশুদ্ধ? কার মানদন্ডে সঠিক তা নিয়ে কখনোই প্রশ্ন তুলিনা। যদি কেউ এতদসংক্রান্ত প্রশ্ন তুলে; তাহলে বিষয়টিকে কেবল নারীর জন্য সযত্নে আগলে রাখি। শব্দের গাঁথুনী কিংবা বাক্যবানে অথবা যুক্তির বেড়াজালে নারীকে করি তুলি অপাঙ্তেয়। অথচ আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি সম্পর্ক যদি নিরন্তর আত্মাকে খোজাঁর আত্মোৎসব হয়,তাহলে এই প্রক্রিয়ায় যৌনতার সম্পর্ক অধ্যয়নের একটা বৈধতা পাওয়া যায় (নিউটন সম্পাদিত:২০১৫:৬৭)। নারী পবিত্র বা অপবিত্র যাই হোক না-আলোচনার বিষয়বস্তু নারীর শরীর ও তার ব্যবহারের মনস্তাত্তিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিক অবতারনা করাই এ লেখার উদ্দেশ্যও বটে। কারণ, সমাজ একে অপাঙ্তেয় করে রেখেছ।

কৃষির সূচনা নারীর হাতে, তাহলে বলা যেতেই পারে-অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ভিত্তি নারী। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ব ও তথ্যমতে নারী তার দৃঢতায় পথ চলতে পারেনি। বারবার পথচ্যুত হয়েছে, হারিয়েছে তার সততা ও বিশুদ্ধতার উপাধিটি। ফলে নারীর শরীর কেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার কিংবা সমঅধিকারের প্রসঙ্গটি আলোচনার জগতে ফিরে এসেছে বারবার কখনো হয়তো নারীবাদ নয়তো ন্যায্যতা নামক ধারনা দিয়ে। ফলাফল নারীর শরীর থিতু হয়েছে বটে কিন্তু ক্ষমতায়ন আজোও সুদূঢ় পরাহত। কেন? স্বাভাবিক প্র-প্রশ্নের আচমকা চাওয়ার তাগিদে ঐতিহাসিকে একটি ছবি ও প্রচলিত গানের মাঝে কেবলই তত্ত ও তথ্য নিয়ে একটুখানি ঘাটাঘাটি মাত্র। সিরিয়াস আমার তরফ হতে তো নয়ই, আপনারটা আপনার ব্যাপার। যাইহোক, প্রখ্যাত মার্ক্সসিস্ট ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় অনুবাদ) পরিবারের বিবর্তনের যে ধারাটি দেখিয়েছেন সেখানে নারীর যৌন স্বাধীনতা হরণের বিষয়টি স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাই তো যৌনবৃত্তিতে নারীর কলঙ্ক তিলক থাকলেও পুরুষ পরিচয় দেয় এটাই পৌরুষত্ব কিংবা শৌর্ষ-বীর্যের লক্ষণ হিসেবে। রেবতী বর্মন (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) বলুন কিংবা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসই (২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় অনুবাদ) বলুন, প্রথমতঃ গর্ভধারনের দরুন যৌন পরাধীনতা এবং দ্বিতীয়ঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিলোপই নারীকে টেনেছে পিছনে। এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। যা স্পষ্ট করা হয়েছে এ লেখার শেষ শিরোনামে।
মার্কসীয় ধারায় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে উদারনৈতিকতার নামে যৌনবৃত্তির বৈধতা দিলেও সমাজ-সংস্কার একে বৈধতা না দিয়ে বরং টেনেছে আরো পিছনে। উত্তরোত্তর প্রযুক্তির বিকাশে নারীর শরীর বরাবরই লক্ষ্যবস্তু। তাই ইস্টার বশেরাফের- নারী ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারীর শরীর থেকে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী সরাতে তো পারেনি বরং দৃষ্টি দিয়েছে আরো সতর্কভাবে। পুরুষ নারীকে পেতে চায় বিভিন্ন উপায়ে এমনকি ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বে হলেও।
পরকীয়া-নারী ও পুরুষের যৌন চর্চার এমনই একটি সামাজিক প্রপঞ্চ যা নারীকে বিবেচনা করে ভোগ্য পণ্য হিসেবে। অর্থ্যাৎ বাৎসায়নের মতে ধর্ম, অর্থ, কাম এ তিনের সাথে জড়িয়ে আছে এক কুহুক মায়ার মতো

নিষিদ্ধ উত্তেজনার অনুভূতি। এই শরীরেই অবস্থিত, তাই এটি আহারের সমধর্ম (পৃথ্বীরাজ: ১৪০৭ব: ২৪)। এই ভোগ্য পণ্যের সরব উপস্থিতি আমরা হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্যাপদেও পাই এভাবে- ”যে বঁধুটি দিনের বেলায় কাকের শব্দে ভয় পায়। সেই বঁধুটিই আবার রাতের বেলায় অভিসারে যায়। চর্যাপদের কবি ঢেগুণপার কবিতায় পাওয়া যায়-“টলেত মোর ঘোর নাহি পড়াবেষী হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।” অর্থ্যাৎ- ঘরে ভাত না থাকলেও প্রেমিক এসে ঘরে ভিড় করে। আহা! কী শান্তি পরকীয়ায়? অন্যের দখলে থাকা ভূমিতে চাষাবাদ করো ইচ্ছেমতো? কিন্তু প্রশ্ন কেন? উত্তরে বলা যায়-কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র যদি বন্টন, উৎপাদন, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ক প্রাথমিক ধারনা বা আলোচনার শাস্ত্র হয় তবে বাৎসায়নের কামসূত্র যৌনতা চর্চার মৌলিক শাস্ত্রও বটে। এখানে যৌনতা চর্চার যে ধরন ও ধারনের কথা বলা হয়েছে তা ধ্রুপদী এবং পরকীয় বা পরকীয়া চর্চার ক্ষেত্রে যৌনতার সাবলীল বর্ণনায় ইচ্ছেমতো ভোগ-দখলের বিবরণ পাওয়া যায়। যদি আমরা ব্যভিচারিতা বা বহুকামিতা নামক দোষে দুষ্ট হতে না চাই, তাহলে কামসূত্র আমাদের পাঠ করতেই হবে (পৃথ্বীরাজ: ১৪০৭ব: ১১) এবং এ সংক্রান্ত আলোচনার দ্বার খুলতে হবে। যদিও আমরা একে রাজনীতির টেবিলে ফেলতে চাই,যা চিরায়ত কিংবা আমাদের অনভ্যাসের ফলাফল। কারণ, এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অর্জন ও বন্টনে পাই ঠিক তেমনি ক্রিস্টিনা ডেলফির খাবার টেবিলের খাদ্য বিভাজন বা অংশীদারিত্বেও পাই। কাম, প্রেম, ভালোবাসায় তা অনুপস্থিত থাকবে এমনটা ভাবা যায়না। সবই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত, পরকীয়াও এ হতে মুক্ত নয় বরং যৌক্তিকভাবে যুক্তিযুক্ত।

নারীর অঙ্গ বর্ণনা বাংলা গানের বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে- কবিতায় উপন্যাসে, গীতি নাট্য, প্রবন্ধ, মহাকাব্যে এমনকি গবেষণায়ও।নারীর অঙ্গ বর্ণনায়-হাজারো শব্দের সমাহার। কিন্তু গানে পরকীয়ার সন্ধান বিশেষ অঙ্গের বিশেষ ব্যবহার পাওয়া যায় এভাবে- ”ভ্রমর কইও গিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে অঙ্গ যায় জ্বলিয়ারে ভ্রমর, কইও গিয়া”। ভ্রমরের দূতিয়ালিতে রাধার ব্যাকুলতা নিরসনে শ্যামের উপস্থিতি পরকীয়া প্রেমের উদাহরণে এই

বিশেষ অঙ্গের কি যে জ্বলুনি তা সহসাই অনুমেয়। কিংবা ”ঐ শুনো কদম্ব তলায় বংশী বাজায় কেরে সখী, বংশী বাজায় কে”? এখানেও পরকীয়া প্রেমের সরস উপস্থিতি পাওয়া যায়। রাই যখন সখীর সনে কলসীতে জল ভরতে যমুনা নদীতে যায়, তখন কৃষ্ণ বাঁশী বাঁজায়ে চায় রাধাকে আকৃষ্ট করতে। রাধা বিবাহিত বলে কলঙ্কের দাগ কিংবা ভাগ তাকেই নিতে হয়। এক্ষেত্রে বোঝাবুঝির দায় থেকে নারীর যৌনতার দায় বেশী এবং তার পরিধি ও পরিসরের বিষয়টিও বিবেচ্য বলে মনে করতে হবে। নচেৎ নারীর সামাজিক অস্তিত্বকে আমরা যৌনতায় পরিসীমিত করে ফেলবো একটি ছক বা কাঠামোর মধ্যে দিয়ে।
গানে আমরা যখন শুনি-”চল বিয়াইন আজ মন কুড়াতে যাই” শীর্ষক বাংলার ফোক সঙ্গীতে (পাঠক গ্রাম-বাংলার বিয়াইন সর্ম্পকটিকে বিবেচনা করে নারীর সামাজিক অস্তিত্বকে বিবচেনা করুন) যখন বিয়াইনকে মন কুড়ানোর প্রস্তাব দেয়া, তখন স্পষ্টতঃই পরকীয়া প্রেমের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিংবা আমরা পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের গানের সুরে বলতে পারি যে, ”আমায় এতো রাতে কেনে ডাক দিলা, প্রাণ কোকিলা রে; শিয়রে শ্বাশুড়ী ঘুমায়, জ্বলন্ত ডাকিনী; পইঠানে ননদী শুয়ে দুরন্ত নাগিনী।” পুরো গানটি শুনলে ধ্রুপদী বাংলার চিত্র পাওয়ার পাশাপাশি আপনি প্রেমের চিরন্তন পরকীয়ার রসায়নটি পাবেন। অর্থ্যাৎ নারীর প্রেমকে বরাবরই দেখা হয়েছে কালিমালেপনের প্রক্রিয়ায় অবজ্ঞাভরে । অথচ একই কাজে পুরুষকে দেখা হয় সুপুরুষ হিসেবে। যার কারণে বলা যায় প্রেম শব্দটি উভয় লিঙ্গের কাছে কোন ভাবেই একই অর্থ বোঝায় না। এই বোঝা এবং না বোঝার দায় থেকে লিঙ্গীয় ভাবনা থেকে যে আলোচনার সূত্রপাত, সেখান হতে বের হয়ে আমরা একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবো । যে আলোচনায় যৌনতার ডিসকোর্সে একটি সম্পর্ক কিভাবে বহুধা বিভক্ত হয়ে নারী মুক্তির উপায় কিংবা অন্তরায় (পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল) হয়ে উঠে তাই সক্রিয় বিবেচ্য বিষয়। লেখাটি পাঠ করতে গিয়ে পাঠককে আরো বিবেচনায় নিতে হবে যে, আমাদের ঐতিহ্য ফোকগান ও লোকশাস্ত্রের বর্ণনানুসারে যৌনতা শব্দের ভাষাগত বিনির্মাণ মাত্র যেটি বিদ্যাতয়নিক নারী কেন্দ্রিক চর্চার-অনুষঙ্গ নারীবাদ সম্পর্কিত সমাজে প্রচলিত তত্ত্ব তালাশের ক্ষেত্রে ভূতের

বেগার খাটা মাত্র। নারীর একটি অঙ্গের বর্ণনায় কেবলই সাহিত্যিক কলা -কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে রুপকের।

অঙ্গের জ্বলুনি ও বনমালি কিংবা বনমালি বিহনে অঙ্গের জ্বলুনি

“ভ্রমর কইয়ো গিয়া - শ্রী কৃষ্ণের বিচ্ছেদে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া ” এমন গানের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পূর্বে গানের লিপিকার সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ রাধা -কৃষ্ণের উপস্থিতি সংবলিত ফোক বা লোকায়ত সংক্রান্ত গান ও সুরের স্বীকৃত প্রদান না করার বড়রকমের বিতর্কও দেখা যায় (চৌধুরী :২০০০;নিউটন: ২০১৫)। এ গানের গীতিকার রাধারমন দত্তের (১৮৩৩-১৯১৫) জন্ম তৎকালীন শ্রীহট্ট বা হালের সিলেটে। এ অঞ্চলের পঞ্চখণ্ডে ত্রিপুরাধিপতি 'ধর্ম ফাঁ ' কর্তৃক সপ্তম শতকে মিথিলা হতে আনিত প্রসিদ্ধ পাঁচ ব্রাহ্মণের মধ্যে 'আনন্দ শাস্ত্রী ' নামক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব রাধারমণ দত্তের পুর্ব পুরুষ ছিলেন বলে গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। আনন্দ শাস্ত্রীর প্রৌপুত্র নিধিপতি শাস্ত্রীর পুত্র ভানু নারায়ন। উক্ত ভানু নারায়নের চার পুত্রের মধ্যে রামচন্দ্র নারায়নের এক পুত্র ছিলেন প্রভাকর। বলা হয়ে থাকে যে , মুঘল সেনাপতি খোয়াজ উসমান দ্বারা ইটা রাজ্য অধিকৃত হলে , এই রাজ বংশের লোকগণ পালিয়ে গিয়ে আশে পাশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় প্রভাকর দত্ত তার পিতার সাথে আলিসারকুল চলে যান এবং সেখানে কিছু দিন বসবাস করার পর জগন্নাথপুর রাজ্যে এসে আশ্রয় নেন। কিছু দিন পর জগন্নাথপুর রাজ্যের তৎকালীন অধিপতি রাজা বিজয়সিংহের অনুমতিক্রমে প্রভাকর জগন্নাথপুরের নিকটস্থ কেশবপুর গ্রামে বাড়ী নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করেন।

পরবর্তীতে রাজা বিজয় সিংহ প্রভাকরের পুত্র সম্ভুদাস দত্তকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন। অতপর বানিয়াচংয়ের রাজা গোবিন্দ খা বা হবিব খার সাথে বিবাদে জগন্নাথপুর রাজ বংশের বিপর্যয়ের কারণ, রাজআশ্রীত কর্মচারীরাও দৈন্য দশায় পতিত হন । এ সময় সম্ভুদাস দত্তের পুত্র রাধামাধব দত্ত অন্যের দ্বারস্থ না হয়ে, অনন্যচিত্তে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। রাধামাধব দত্ত সংস্কৃত ভাষায় জয়দেবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'গীত গোবিন্দ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া তার রচিত ভ্রমর গীতিকা, ভারত সাবিত্রী, সূর্যব্রত পাঁচালি, পদ্ম-পুরাণ ও কৃষ্ণলীলা গীতিকাব্য উল্লেখযোগ্য। এই প্রসিদ্ধ কবি রাধামাধব দত্তই ছিলেন রাধারমণ দত্তের পিতা।

কবি রাধারমণের পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় উপাসনার প্রধান অবলম্বন সংগীতের সংগে তার পরিচয় ছিল শৈশব থেকেই। খ্যাতিমান লোককবি জয়দেবের গীতগৌবিন্দ এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন তার পিতা রাধামাধব দত্ত। পিতার সংগীত ও সাহিত্য সাধনা তাকেও প্রভাবিত করেছিল। ১২৫০ বঙ্গাব্দে রাধারমণ পিতৃহারা হন এবং মা সুবর্ণা দেবীর কাছে বড় হতে থাকেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দে মৌলভীবাজারের আদপাশা গ্রামে শ্রী চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ সেন শিবানন্দ বংশীয় নন্দকুমার সেন অধিকারীর কন্যা গুণময়ী দেবীকে বিয়ে করেন। পিতার রচিত গ্রন্থ গুলো সে সময় তার জন্য পিতা আদর্শ হয়ে অন্তরে স্থান করে নেয়। কালক্রমে তিনি একজন স্বভাবকবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। রচনা করেন অংখ্য বাউল গান । লিখেছেন কয়েকশ ধামাইল গান। জানা যায়, সাধক রাধারমণ দত্ত ও মরমি কবি হাসন রাজার মধ্যে যোগাযোগ ছিল। অন্তরের মিল ছিল খুব বেশি। তাদের মধ্য বিভিন্ন সময় পত্রালাপ হতো কবিতায়।

ফিরে আসি প্রাসঙ্গিক বনমালীতে। কে এই বনমালি? সোজা সাপটায় বলা যেতে পারে যে, দাপর যুগের ত্রাতা- কৃষ্ণ। সর্বভারতীয় অঞ্চলে যখন অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায় তখন অযোধ্যায় দেবকী ও বাসুদেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন ঐযুগের অবতার-

কৃষ্ণ। ছোট বেলায় ডানপিটে, দুরন্ত বালক, মামার কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঝড়ের রাতে বাসুদেব অলৌকিক ক্ষমতার লীলা খেলায় বৃন্দাবনে যশোদার ঘরে রেখে আসেন। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যত লীলা খেলা–এই বৃন্দাবনে। যেখানে একই সময়ে তথাকথিত ১৫ দিন পর জন্ম নেয় রাধা - প্রেম ও খেলার ঊভয়ের সাথী। এই রাধা-কৃষ্ণের রসায়ন নিয়ে যতো প্রেম-কাহিনী আর গল্পে হয়েছে সবগুলোই প্রেমের মাহাত্ম্য বা জীবাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ পরকীয়া প্রেমের এক নিদারুন আদর্শের উদাহরণ টেনে তুলে ধরেন। যুগে যুগে এ প্রেমের মাহাত্ম্য এতই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখন বলা হয় প্রেমের আসল মজা নাকি পরকীয়ায়। সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাই এ ধরনের প্রেমের জয়-জয়কার বটে। ওই যে, ভালো লাগার নিজস্ব ধরনটুকু হতে হবে আপনার - আপনি কি করবেন- আপনার উত্তরের উপর নির্ভর করবে আপনার কর্ম ও কর্মের ফল?
এই শ্যাম-রাই, যাদের প্রেমের উপর বাংলার লোক সংস্কৃতি জগতে দু’টি বিখ্যাত গান পাওয়া যায়। সেই গান দুটোর আলোকে আজকের পরকীয়া প্রেমের শবচ্ছেদ করার একটি প্রয়াস মাত্র যা আমাকে ভালো লাগে এমন একটি প্রত্যয়ের বিচ্ছুরণ মাত্র। যেমন- “বনমালি তুমি পর জনমে হইও রাধা।” আর দ্বিতীয় সঙ্গীত খানা- “ভ্রমর কইয়ো গিয়া- শ্রী কৃষ্ণের বিচ্ছেদে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।” “বনমালি..............পরজনমে হইও রাধা।” আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যৌনতা সম্পর্কিত আলোচনা বাতুলতা মাত্র অথচ বাৎসায়ন এসংক্রান্ত আলোচনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ - খ্রিস্টাব্দ ২০০ সময়ে রচিত তাঁর কামসূত্র নামক বিখ্যাত গ্রণ্থে। ধর্ম, অর্থের ন্যায় যৌনতাকে তিনি সমগুরুত্ব দিয়েছেন একটি সুস্থ জাতি বিনির্মানে। এ সম্পর্কিত আলোচনা মানেই এক ধরনের সুড়সুড়ি কারণ এ রকম শিরোনাম যে লেখার বিষয়বস্তু হতে পারে তা আমাদের চিন্তা-চেতনায় আসেনা মধ্যবিত্তের দার্শনিক চিন্তার দৈন্যতার কারনে। ভালোবাসা আর চিন্তার দৈন্যের কারণে একে অশ্লীল বা বিতর্কিত আমরা ভাবতেই পারি। কিন্তু সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে এ যৌনতা, প্রেম পরকীয়া (রায় ও অনন্যা: ১৪২৬বঙ্গাব্দ)। কিন্তু চিরন্তন এ অস্বীকার নয় বরং এতদ্বিষয়ে আলোচনা এখন বিশ্বায়নের যুগে

প্রযোজ্যই বটে তা না হলে এ সংক্রান্ত ডিসকোর্স তৈরী হতো না বিদ্যাতয়নিক জ্ঞানকান্ডে (চৌধুরী :২০০০; নিউটন: ২০১৫)। যদিও এসবের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। আছে লুকোচুরির খেলা ও নিষিদ্ধ সম্পর্কের প্রবাহে দেহকেন্দ্রিক সংযোজন,যেখানে পুরুষতান্ত্রিকতার নির্মম আঘাতে নারীকে করেছে ক্ষতবিক্ষত।

যৌনতা ও প্রেম সম্পর্কিত আলোচনা বিষয়ে আমাদের তথা ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিবর্তনীয় চিত্র পাই বাঙালীর জীবনে রমনী গ্রণ্থে।প্রেম , কাম, শ্লীলতা , আর অশ্লীলতার - উদাহরণ সমেত বিস্তারিত আলোচনার ধারাবাহিকতা আমরা আত্মঘাতী বাঙ্গালী গ্রণ্থেও পাই।

ভদ্র সমাজে যৌনতা নীতিগত দিক হতে এ বিষয়টি সকল সময় আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বর্জনীয় কিংবা অপাঙ্‌তেয় আলোচনা। কারণ এটা নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনের একটি বড় বিনোদন। বিশেষত শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তা তাদের জীবনের অনুষঙ্গ। ভদ্রলোকেরা এ বিষয়ে সতর্ক এবং বহুক্ষেত্রেই নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (কবীর:২০১৪) এমন ভাবনার বহি :প্রকাশ আমরা চৌধুরীর (১৪২৩ বঙ্গাব্দ) লেখায় পাই প্রবলভাবে। অথচ এ সকল নিম্নবর্গীয় কন্ঠস্বরের উপস্থাপনা আমাকে তাড়িত করে যথেষ্টভাবে সময়ে কিংবা অসময়ে। অথচ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির দিক হতে অপরিহার্য বলে মনে করা হয় এই যৌনতাকে।যদিও বলা হয়ে থাকে যে ,অবস্থান ও মর্যাদাভেদে এটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। তাই বলা হয় যে , ছোট লোকের কামে ও ভদ্র লোকের কামে তফাত আছে। সাধারন লোকের কাম স্বাভাবিক কিন্তু একেবারেই ছ্যাঁচড়া (চৌধুরী : ১৪২৩(ব):২৭) যাকে আমরা বলতেই পারি অশ্লীলতা (কবীর: ২০১৪)। যেই শ্রেণীভেদেই ঘটুক না কেন -ভদ্রলোক বা ছোট লোক -এই কাম বা যৌনতা বা অশ্লীলতা -কোনটিকেই কি কারো অস্বীকার করার মতো সাহস আমার ,আপনার আছে? নাকি জীবনের এ সকল অপরিহার্য কার্যকে এড়িয়ে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবো মূর্খ হিসেবে ? সম্ভবতঃ কেউ করতে তা সম্মত হবে না। আর এমনটা করলে জীবনকেই তুচ্ছ করতে হবে। এই জীবনকে তুচ্ছ করার মতো -সৎ সাহস আমাদের নেই ? অন্ততঃ এতটুকু বলতে পারা যায় যে , একেবারেই নেই বলে শতভাগ নিশ্চিত।

নিজের ভালোলাগার বিষয়ে আমি শতভাগ নিশ্চিত হলেও অন্যের বিষয়ে সিকি ভাগও নই। তবে সন্দেহও নেই। যে নারীকে দেবতারাও পর্যন্ত বুঝতে পারেন না। সেক্ষেত্রে আপনার বোঝার দায় না নিলেও আমার বোঝার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। বাৎসায়ন নারী ও পুরুষকে চার ভাগে ভাগ করেছেন-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে। কিন্তু নীরদ চন্দ্র চৌধুরী স্ত্রীদের তিন প্রকারে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি তাঁর বন্ধুর পথপরিক্রমায় তা উপলব্ধি করেন যা ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া যায় বলে উল্লখে করেন। এই তিন প্রকার স্ত্রী হলেন ---
- স্বীয়া
- পরকীয়া
- সামান্যবনিতা
এই তিন শ্রেণীর আলোচনার ব্যাখ্যা যাই থাকুক-আমাদের সমাজে প্রেম ভালোবাসার সাথে যৌনতার একটি সম্পর্ক আছে এবং পরকীয়া একটি উৎকৃষ্ট প্রেমের উদাহরণ হিসেবে অনেক বোদ্ধামহল মনে করেন। যদিও এ সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাতে সকল-সময়ে ও বিষয়ে সতর্ক আচরণ করতে হয় বলে নীরদ চন্দ্র হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এভাবে “যে কোনও দেশের ভদ্র সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাভিচার না স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কিত অন্যনীতি বিরুদ্ধ আচরণ কতটা পরিব্যপ্ত, তাহা নিরূপন করা সবসময়ই দুরূহ।” কারণ আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বরাবরই “বাহিরে ফিটফাট,ভিতরে সদরঘাট” নীতি অতি সর্ন্তপনে অনুসরন করে থাকি। আর এর ফলে অনাচার গোপন করা বা রাখাকে আমরা কর্তব্য বলে মনে করি। তাই উনিশ দশকের বিশশতকে শিখা পত্রিকায় পত্রিকায় (১৯২৬)-মূলমন্ত্র ছিল “জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আদৃষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব”। ইদানিংকালেও কি আমরা যৌনতা চর্চার ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন আমাদের সামাজিক জীবনের অভ্যাস কিংবা অনভ্যাসে দেখতে পাই।

তাই, ভদ্র সমাজের না জানার ভাব ধরে রাখার মুশকিল হলো- এ বিষয়ে সঠিক সংখ্যার কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে, কানাঘুষা, নিন্দা, তামাশা, কেচ্ছা-কাহিনী আর ষোল প্রকারী পরিবেশনের

মাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পারি তাহার বিদ্যায়তনিকের ভাষায় নির্ভরতার তথ্য হতে পারেনা কিন্তু মনস্তাত্তিকের ভাষায় আশ্বস্ত তো হতে পারি। তাই,এরকম বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক পরিবেশনের পাশাপাশি আমাদের মনে এও রাখতে হবে যে, ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতায় সকল সময়ই একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই অর্জিত হয়ে থাকে, যা দর্শনের আরোহ কিংবা অবরোহ সূত্রানুসারে বৃহৎপরিসর বা জনগোষ্ঠীর কাজে লাগানো হয় বা বিচার করা হয় মাত্র। তাই যখন শুনি-
“ভ্রমর কইও গিয়া-
শ্রী-কৃষ্ণের বিচ্ছেদে অনলে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া রে।
ভ্রমর কইও গিয়া।
কইও, কইও, কইও, রে ভ্রমর কৃষ্ণরে বুঝাইয়া
মুই রাধা মইরা যামু- কৃষ্ণ ছাড়া হইয়ারে।
ভ্রমর কইও গিয়া
ভ্রমর রে -
আগে যদি জানতাম রে ভ্রমর যাইব
রে ছাড়িয়া
আমার দেহের দুই ভাগ কইরা রাখিতাম
বান্ধিয়া রে
ভ্রমর কইও গিয়া।
ভ্রমর রে।
ভাইবে রাধা রমন বলে, শোনরে কালিয়া, নিভা ছিল মনের আগুন, কী দিলা জ্বালাইয়া রে- ভ্রমর কইও গিয়া।”
কূল রাই - এর এমন অনুভূতির পূর্বে শ্যাম যা বলেছিল -
“আমার আসিবার কথা কইয়া
মান করে রাই
রইয়াছ ঘুমাইয়া।
আমার কথা নাই তোর মনে
প্রেম করছ আয়ানের সনে
শুইয়া আছ নিজ পতি লইয়া।
আমি আর কতকাল থাকব রাধেগো দুয়ারে দাঁড়াইয়া।”
রাধারমনের এ গানে আমরা রাধার প্রতি কৃষ্ণের অভিমান বুঝতে পারি। আরো জানতে পারি- রাধা তার নিজ স্বামী আয়ানের সাথে

ঘুমাইয়া থাকলেও ইতঃপূর্বে অভিসারের কথা বেমালুম ভুলে গেছে বলে শ্যাম মনে করেন। শ্যাম এও মনে করেন-ঘন আধারে যমুনার ঘাটে তোমার আমার মিলনে এক মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারতো; কারণ শাস্ত্রে বলে – “দূরাকীর্ণ ভূমি শয্যায় পরপুরুষ সঙ্গম নারীদের একান্ত প্রীতিকর (পূরবী:২০১৩:৮২)। সুতরাং বলা যায় যে, পরকীয়া একটি কেবল শিল্পও নয় বরং আত্মমোহনের মধ্য দিয়ে বিনোদনও বটে। যেটি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। রাখাল বালকের এমন আবেদন গোয়াল কন্যা যে গ্রাহ্য করেনি তা নয়। বরং সেও অস্থির দূরাকীর্ণ ভূমি শয্যায় প্রীতিকর মিলনে। এমন একটি গান আমরা শুনতে পাই জসিম উদ্দীনের লেখায়--

“আমায় এতো রাত কেন ডাক দিলি প্রাণ কোকিলারে; আমার নিভা ছিল মনের আগুন
জ্বালাইয়া গেলি রে।

শিয়রে শ্বাশুড়ী ঘুমাই, জ্বলন্ত নাগিনী হায়রে হায় - জ্বলন্ত নাগিনী
আমার পইতানে ননদী শুয়ে- দুরন্ত নাগিনী আমায় এতো রাতে কেন ডাক দিলি।” (চৌধুরী:২০০০) আদিমকাল কিংবা যুথবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন প্রক্রিয়ায় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায়, যৌথ পরিবার একটি অনুষঙ্গ উপাদান যা নৃবৈজ্ঞানিক লেখালেখি বা এ বিজ্ঞানের বিদ্যাতয়নিক জানাশোনা অন্ততঃ তাই বলে। যেখানে স্বামীর সাথে স্ত্রী কিংবা স্বামীর অনুপস্থিতিতে শাশুড়ী, ননদ কিংবা অন্যরা ঘুমাবে এমন বাস্তব হালনাগাদ গ্রাম বাংলায় এখনও দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে,স্ত্রী অবশ্যাম্ভী প্রয়োজনে ঘরের বাহির হলে স্বামী কিংবা শ্বাশুড়ী অথবা ননদ অর্থ্যাৎ কেউ না কেউ সাথে থাকবে। সেখানে মাঝ রাতে রাধার একা ঘরের বাহির হওয়া, হাল নাগাদের কথা বিবেচনা করলেও দুঃসাধ্যও বটে।

অর্থ্যাৎ-শ্যামের আহবানে রাধার সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কোনো উপায় ছিলোনা। কারণ হিসেবে- জামাই, শাশুড়ী আর ননদীকে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে রাতের আঁধারে ঘরের বাহির হয়ে দেখা করার অদম্য ইচ্ছাকে অবদমিত করতেই হয়। এ প্রেমের আবেগময় তাড়না,

অভিমান একসময় পরিপূর্ণতা পায়, শ্যাম যখন গোকুল ছেড়ে চলে যান মথুরায়। আপাততঃ রাধা মান করলেও সেই অভিমান রাধা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। কারণ রাধা-কৃষ্ণের প্রাকৃতিক সম্পর্কের বন্ধনের দরুন শ্যামকে দেখার ইচ্ছা প্রবল হলে, রাধা আর মান ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। বরং কূলবধুটি বিচ্ছেদে পীড়িত হয়ে তার সখিদের প্রতি অনুযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করেন এভাবে ----
“সখি আমিই না হয় মান করেছিনু তোরা তো সকলে ছিলি।
কেন নাহি ফিরাইলি।

তোরা তো হরির স্বভাব জানিস তার স্বভাবের চেয়ে পরভাব বেশি তোরা তো হরির স্বভাব জানিস। তার স্বভাব জেনেও রহিলি স্ব-ভাবে
ডাকিলি না পরবোধে।
তোদের পরমপুরুষ পরবোধে, ডাকিলি না পরবোধে। তোরা তো চিনিস, হরিরে, প্রবোধ কেন দিলি নে সই;
ডাকিলি না পরবোধে, ডাকিলি না পরবোধে।” (কাজী নজরুল ইসলামের কীর্তন) হরির প্রেমে উন্মত্ত রাধা, আর রাখ ঢাক রাখেনি বরং নারীর সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে রাগ-অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। সমাজ-সংস্কৃতিতে ঐ সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা নারীজাতির যে চিত্র বা প্রতীক পাই, সেই হিসেবে নিঃসন্দেহে রাধা বিদ্রোহের বিমূর্ত প্রতীকও বটে। আজকের যুগের আলোকিত ও শিক্ষিত নারীর চেয়ে-নিজের যৌন স্বাধীনতা প্রকাশে অনেক অনেক দূর এগিয়ে বটে। আজকের নারীবাদীরা নারীমুক্তির যে সকল পন্থা বাতলে দিয়েছে, সে সকল বাতলে দেওয়া পন্থার মধ্যে যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা হলো যৌন দাসত্ব থেকে নারীর মুক্ত হওয়া। ঘরে স্বামী সংসার রেখে- জনে জনে প্রেমিকের ভালোবাসা খুঁজে ফেরা কিংবা তাতে পুনরায় আত্মীকৃত হওয়ার বিপুল বাসনা যা নারীমুক্তির আন্দোলনে প্রথম ঝাণ্ডাধারী নারী যে বিনোদিনী তা এ তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বলা যায়? সবকিছুরই যখন অর ন্য রোদন হলো, তখন রাধা, কৃষ্ণকে অভিশাপ দেয় নারীর স্বভাব

সুলভ ভঙ্গিতে, যেখানে রয়েছে আত্মতৃপ্তি, ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা প্রতিশোধ স্পৃহা। শোনা যাক রাধার অভিশাপ বচনটি----
“তুমি আমারি মতোন জ্বলিও, জ্বলিও
বিরহ কুসুম হার গলেতে পরিও
তুমি যাইও যমুনার ঘাটে
না মানি ননদীর বাধা
বনমালি তুমি পরজনমে হইও রাধা। তুমি আমারি মতোন কান্দিও, কান্দিও বদনে কৃষ্ণ নাম জপিও
তুমি বুঝিবে তখন, ...
নারীর বেদন
রাধারও প্রাণে কতো ব্যথা।
তুমি আমারি মতোন মরিও মরিও শ্যামও কলঙ্কের হার গলাতে পড়িও। তুমি পুড়িও তখন
আমারি মতোন
বুকে লইয়া, দুঃখের চিতা।
আমি মরিয়া হইবো
শ্রী নন্দের নন্দন
তোমারে বানাবো রাধা।”
লোকায়ত কিংবা ফোকগানের ঢং এ অঙ্গের জ্বলুনিতে আপাততঃ জল কিংবা অভিশাপ বচনে সমাপ্তি হয়তো টানা যায় কিন্তু প্রশ্নটি যখন শুচিতার তখন এর উত্তর খোঁজার দায়ও পড়ে ।

যৌন শুচিতার অভাব পরকীয়ায়ঃ প্রশ্ন কেন?

নারীর মূল্য কোথায়?শরৎ চন্দ্রের এমন প্রশ্নের উত্তরে যে উত্তরটি মাথায় আসে- তা হলো নারীত্ব (শরৎ:২০০৮:৭)। এই নারীত্ব কোথায় পাওয়া যায়? যদিও শরৎ প্রশ্ন তুলেছেন- ”ইহার কোন মূল্য

হয়না তাই এটা অমূল্য”। কারণ “নারীত্বের সাধারণ মূল্য ধার্য করিবে কি করিয়া” বলে পাঠকের মনে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে শরৎ আপাততঃ নিরুত্তর। তবে, জল যেমন অপরিহার্য আমাদের জীবনে, তেমনি নারীর জীবনে নারীত্ব তেমন গুরুত্ব বলে তিনি মনে করেন। সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় গ্রন্থে-এই নারীত্বের জয় জয়কার এমনকি প্রকৃতির বেলায়। আমরা সবাই নারী চাই, যে নারী কেবলই আমার, সে রক্ষা করবে শুচিতা বা সতীত্ব। কিন্তু বলার ক্ষেত্রে বলছি- প্রেমের আসল মজা পরকীয়ায় বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি! ঠিক অনেকটা বিশ্বমঙ্গলের নাটকে বিধৃত কাহিনীর মতো। শরৎ চন্দ্রের ভাষায় (২০০৮:১৪) এ প্রসিদ্ধ নাটকে গৃহকর্তা নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে অতিথিকে বিমুখ করবেনা (কারণ শাস্ত্রে আছে সর্বস্ব দিয়াও অতিথিকে সংস্কার করিবে) বলে নিজের সহধর্মিনীকে লম্পট অতিথির শয্যায় প্রেরণ করে। পাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও অধর্মের কারণে যমদূতের হাতে মার খেতে হয়।
মহাভারতে এমন পরস্ত্রী সম্ভোগের গল্পের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়। বলি রাজাও তার স্ত্রী দীর্ঘতমাকে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অন্যের সহবাস করান। এরকম ঘটনাকে বিদ্যাতয়নিক চর্চায় বস্তুকামী বলে আখ্যা দেওয়া হয়, যারা নিজের স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গেঁ সহবাস করতে দিয়ে আনন্দ পান; যদিও মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটা মানসিক বৈকল্য। বিদ্যায়তনিক টেক্সট এর ভাষায় এদেরকে অসৎপতি (Cuckold) বলা হয়। আয়ান ঘোষ এমন পতি ছিলো কি না তা বলা যায় না নিঃসন্দেহে। তবে রাধা যৌনতার সম্পর্ক স্থাপনে যে বিপ্লবের সূচনা করেছেন, খ্রি.পূর্ব ৪০০ বছর আগে, নারী সমাজ তা ধরে রাখতে পারিনি বলা যায় বলিষ্টভাবে। মাতৃত্ব অর্জনের মধ্য দিয়ে নারীর যে ঐতিহাসিক পরাজয়ের সূচনা হয়, তা যৌন স্বাধীনতা বিসর্জনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায় (বাখোফেন, এঙ্গেলস, রেবতী প্রমূখ সমাজচিন্তাবিদদের লেখাসমূহ বিবেচনা করুন)।

পৌরুষত্ব এমন এক শক্তি- যা নারীও তার অন্তরে ধারন করতে পারে। যার ফলে নারী হয়ে উঠে বিদ্রোহী, শক্তির আঁধার। পুনরৎপাদনের জন্য হোক কিংবা তার পৌরুষত্ব বিকাশের তরে সে তখন শূচিতার ধার ধরেনা। যা মনে করা হয় কেবলই নারীর জন্য। উদাহরণ, এমন একাধিক

নারীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে। রাধা ব্যতীত কুন্তী, অহল্যা, উল্লুপী, অম্বালিকা, অম্বা, শিখন্ডী সহ আরো অনেকে। দ্রৌপদীর যৌনতা ঐ সময় ও সমাজের জন্য লাগসই হলেও উলূপীর পরস্বামী সম্ভোগে সন্তান পুনরৎপাদনকে আপনি কি বলবেন?

মহাভারতে সমসাময়িককালে উলূপীর ন্যায় অনেক নারী পাওয়া যায়। যারা সাহিত্যের মাধ্যমে ঐ সময় ও সমাজের ছবি প্রতিনিধিত্ব করে কারণ সাহিত্য সমাজের দর্পন তো বটেই। এ সকল নারীর মাধ্যমে যৌন শুচিতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়যে, এটা কেবল নারী জন্য প্রযোজ্য বিষয় ছিলোনা যদিও কালক্রমে এটা নারীর কাছেই প্রত্যাশিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেটা ফ্রেডরিক এ্যাঙ্গেলস পরিবারের নামক সংস্থার বিবর্তনের মাধ্যমে খোলাসা করেছেন তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ-পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি নামক গ্রণ্থে।

যৌনতা বলতে আমরা যাই বুঝি না কেন- পরিবার নির্মাণে বা বির্নিমানে এর ভূমিকা মুখ্য এবং শরীর কেন্দ্রিক। হয়তো এ কারণেই ফুঁকো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের নতুন নতুন বিষয় বস্তু খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন- যৌনতা, শাস্তি ও উন্মাদনা (সুধীর: ২০১০:১৫) ফুঁকো মনে করেন- সেক্স এক বিশেষ ডিসকোর্স, যেখানে বিবাহের ধর্মীয় বা আইনী বাধ্যবাধকাতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্ঞাতি সম্পর্ক ও সম্পত্তি হস্তান্তরের নিয়মাবলী (সুধীর: ২০১০:১৬)। কিন্তু যৌন চর্চায় এ সকল নিয়মাবলী সকল সময় মেনে চলেনি, এমনকি রাধা-কৃষ্ণের যে সম্পর্ক তাতেও এর ব্যত্যয় পাওয়া যায় মহাভারতেও বিদ্যমান অপরাপর অন্যান্য যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। প্রশ্ন হলো যৌন সম্পর্ক স্থাপন কি দাম্পত্য কিংবা পরকীয়ায় শুচিতার দায়ভার কেন এককভাবে নারীর। এটা কি ক্ষমতা চর্চার ফলাফল না কি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থারই ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া, যা আজও বহমান আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

যে প্রতিক্রিয়ায় ফুঁকো উত্থাপিত অবদমনের প্রকল্পের (রিপ্রোসিভ হাইপো বিসিস)-টের/ইঙ্গিত পাই, যার অস্তিত্ব অনেক আগেই মহাভারতের কাজে পাই। এ প্রকল্প যৌনতাকে নানাবিধ বাধা

নিষেধ, নৈতিকতার বেড়াজালে অবদমিত করে রাখে, করে বিনির্মান। ফলে, এক জটিল ধারণা বা অভ্যাসের সৃষ্টি হয় যা- নানাবিধ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, অনুসন্ধান, কথাবার্তা, লেখার মাধ্যমে প্রকাশকারি বলে একে “ডিসকোর্স” ও ডিসকার্সিভ প্র্যাক্টিস বলতে পারি। যেটি যৌনশুচিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য,তবে শুধুই তার বিষয়বস্তু হবে নারী। ফলে যৌনভাবনায়ত্ত বিবর্তন ঘটে এবং এ ভাবনার কেন্দ্রমূলে থাকে শারীরিক মিলনকে কেন্দ্র করে। এমন দেহগত মিলনের যে স্থুল চিন্তা তার অতি প্রকটরূপ আমরা ভারতীয় ঐতিহ্যে দেখতে পাই এবং প্রাচীন মহাকাব্য পুরাণ শাস্ত্রে নারী পুরুষের কাম চরিতার্থ করবার প্রবণতা বড় রকমের বাড়াবাড়িও লক্ষ্য করি (সুধীর: ২০১০;আহমেদ: ২০২০)। এ রকম বাড়াবাড়ি আমরা কেবল নারীর শরীরের নিয়েও পাই। দেখা যেত পারে পরবর্তী উপ-শিরোনামে--।

কামাতুর শরীরে সিক্ত হলো নারী: পুরুষ সমাজ কি শুচিতার উর্দ্ধে?

পূবোর্ক্ত শিরোনামের শুরুতেই প্রশ্ন ছিল -নারীর মূল্য কোথায়? প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরতের এ প্রশ্নে উত্তর আমরা পাই হুমায়ুন আজাদের (২০০০) লেখায়। তার পূর্বে একটি কামাতুর শরীরের পৌরাণিক গল্পের নায়িকার প্রাসজ্গিক অবতারনা। একটি নারী। পাঁচ সন্তানের জননী। একটি প্রজনন অঙ্গের মালিক; যদিও প্রকৃত মালিক তার স্বামী জমদগ্নি। রেনুকা একটি শরীরও বটে। যে শরীরে আছে জীবন ও যৌবন কিন্তু এ দুয়ের মালিক তিনি নন তবে ক্ষমতা প্রয়োগ যন্ত্রের অংশ বটে। এ শরীরের একছত্র মালিক তার স্বামী কিন্তু পুনরুৎপাদন কিংবা জন্মহার নিয়ন্ত্রণ হবে নারীর শরীরের মাধ্যমেই, নিয়ন্ত্রক স্বামী। তাইতো পাঁচ পুত্র সন্তানের পরিশ্রমী রেনুকা যখন নদীতে স্নান করতে যান। তখন দেখতে পান যে, তার দেশের রাজা নদীর আরেক পাশে তার রানীদের সঙ্গে জল কেলী খেলছে। রাজা-রানীদের এই জল কেলীতে স্বভাবতঃই রেনুকা নিজেই কামাতুর হয়ে পড়েন, যা আমার-আপনার জন্যও প্রযোজ্য কারন-“চোখের দাবি মিটলে পরে তখন খোঁজে মন, তাই তো প্রভু সবার আগে রূপের—” (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/ মদনমহোৎসব)। জীবন ও যৌবন ভরে উঠে রসে। শরীর সিক্ত হয়ে যায়। বিশেষ অঙ্গ ভিজতে থাকে। যাকে রাধার ভাষায় বলা হয়- অঙ্গের জ্বলুনি। রেনুকা কিন্তু এ অঙ্গের জ্বালা তার দেশের রাজা দ্বারা নিভায় না বা মনে মনে কামনা করেও না। কিন্তু ঋষি স্বামী জমদগ্নি, তাঁর ধ্যানের ক্ষমতা বলে বুঝতে পারে যে, রেনুকার শরীর কামার্ত হয়েছিল, ভিজে গিয়েছিল শরীরের বিশেষ অঙ্গ। রেনুকা তার যৌন শুচিতা হারিয়েছে, মনের অজান্তেই জড়িয়েছে পরকীয়ায়। হায়রে! পুরুষ রাজাটি জানতেই পারল না যে তাকে দেখে লোভাতুর হয়েছিল অন্য কেউ। অথচ পুরুষ সৃষ্টির অদ্যাবধি থেকে আজ পর্যন্ত দৃষ্টিতে আসা নারীকে পরখ করে দেখে যৌনতার চোখ দিয়ে। জড়িয়ে পড়ে কামনার পরকীয়ায়। সে জন্য কোন পুরুষের শাস্তি তো হয়নি বরং পুরুষ সেজেছে মহৎ! পরবর্তীতে পরকীয়ার মতো মহাপাপের জন্য পিতার আদেশে পরশুরাম তার নিজ মাতাকে কুড়াল দিয়ে হত্যা করেন। বাধ্য সন্তানকে পিতা পুরস্কৃত করাতে চাইলে,

বুদ্ধিমান সন্তান পুনরায় মায়ের জীবন ফেরৎ চান। মহাতপস্বী ঋষি পিতা জমদগ্নি- পুনরায় যৌনশুচি মিলনের জন্য হোক বা সন্তানের মনস্কামনা পূরণার্থে হোক রেনুকাকে পুনঃজীবন দান করেন।

এ জাতীয় অন্য আরেকটি গল্পের অবতারনা করার পূর্বে এটা তো বলা যায় যে, পুরুষ নিজেকে বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে কখনোই আনেননি কিংবা জবাবদিহিতার মুখোমুখি হোননি বা হতে চাননি। কারণ পুরুষ-বরাবরই যৌনতাকে উপভোগ করতে চেয়েছে নিজের মতো করে বিশুদ্ধতার মানদন্ডে আর শুচিতার একেবারেই উচ্চ মার্গীয়তায়। যার ফলে নারী পরিণত হয়েছে যোনি, যৌন বস্তু তথা কামের পরিতৃপ্তির উপকরনে। এখানে পুরুষের দ্বৈত আচরণ লক্ষ্য করার মতো যে, নিজের স্ত্রীকে শুচিতার মোড়কে ঢেকে রাখে, আবার নিজেই পরস্ত্রীকে চেখে দেখে। যেমনটা দেখি ইন্দ্রের বেলায়। ইন্দ্র, গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার সাথে ছলনার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন। ভোরে গৌতম মুনি আহ্নিক স্নানে গেলে, ইন্দ্র গৌতম মুনির বেশে সঙ্গম করেন। কেউ কেউ বলেন- ইন্দ্রকে অহল্যা চিনতে পেরেও সঙ্গমে সম্মত হোন। স্নান শেষে গৌতম মুনি ফিরলে বুঝতে পারেন এবং উভয়কে শাপান্ত করেন।যদিও কেউ কেউ (আহমেদ: ২০২০) একে ধর্ষণ বলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই একে ধর্ষণ বলা যায়না। কেননা উভয়ের সম্মতিতে তা স্থাপিত হয়েছে বরং যে বিচারে আমরা রাধা কৃষ্ণের সম্পর্কের বিচার করতে বসেছি বরং এটা তাদের পূর্বপুরুষের ঘটনামাত্র। কারণ গৌতম মুনি অহল্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলে “মার্জার চলে গিয়েছে।” এই মার্জার শব্দটির অর্থ “নিষিদ্ধ প্রেমিক”। কারণ ছদ্মরূপ চিনতে পেরেও তিনি সঙ্গমে সম্মত হোন।

তাহলে- শুচিতা থাকবে কোথায়? হালের ডেসটিনি কোম্পানীর গল্পের মতো- সবাই ক্রেতা আর বিক্রেতা; যেন একাকার। কিন্তু লাভের হদিশ নাই। কিন্তু যৌনতার ক্ষেত্রে এমনটা হলে মুশকিল নয়, মহামুশকিল হবে-আসান মিলবেনা কোথাও। যার দরুন-পুরুষ নারীকে নির্দেশ করে, নারীর স্বাতন্ত্র্য বোঝায় নিজের স্বার্থে তুলনা করে। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, নারীর যৌন অঙ্গই হচ্ছে সকল নেতিবাচক কর্মকান্ডের সূত্রপাত। নারী তার পরাজয় স্বীকার করে তার এই

বিশেষ অঙ্গ বা যৌনতার কারনে অথবা পুনরৎপাদনের দরুন। তাই রাধা তার যৌনতাকে ব্যবহার করে তার স্বাধীনচেতার কর্মকথা অকপটে বলে গেলেও সমাজ-সংস্কারবাদীরা পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ চাপিয়ে আমরা-কি নারীমুক্তিকে আটকিয়ে রাখিনি? আর এ সকল কারণে বলা যায় যে, নারীর কাছে পুরুষ যৌনতার বিশুদ্ধতা চায় কিন্তু নিজে? প্রশ্নটি অবান্তর। অথচ রাধা তা শুরু করেছিল অনেক আগেই, শ্বাশুড়ি, বর বা জামাই, ননদ পরিশেষে সমাজের রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে নারীমুক্তির কথা বলেছিল প্রকাশ্যেই, অকপটে। তাই রাধা গলায় সুর তোলে মাঠে ঘাটে গেয়ে উঠে-
“খুঁজে খুঁজে ফিরি সরানেরও ধারে, কেষ্টাব্যাটা মোর, গেলো কোথায়? এমন দিনে মোর পিরিতি লাগিল কেষ্টো গরু চড়ায়।
ফাগুন দিনে আসি জলেতে নামিলাম
মন পড়ে থাকে পাড়ে।
বসন ফেলে রাখি, মনেতে ঢেউ লাগি কেষ্টো, নেই কোন ধারে।
ঘরেতে ফিরিলাম, গতর খাটিয়ে
রাতের রং এ শরীরে
পিরিতির চাঁদ উঠে, বাঁশীতে সুর নাই কেষ্টো মরে ঘুমের ঘরে।
আমি খুঁজে ফিরি, আধারে বাদারে পিরিতির জ্বরে, জ্বলে মোর কোথায় গেলো মোর কৃষ্ণ কালারে কোথায় গেলো বৃন্দাবন।”
(অনন্যা খেঁদার গাওয়া গান ইউটিউব লিংক থেকে নেওয়া)
(গীতিকার পাতাল
ক্ষ্যাপা)

আমরা ধরতেই পারি রাধার এমন উচ্চারণ- সাহসী কণ্ঠস্বর। পরকীয়ার প্রেমের জন্য নারী বরাবরই এর শিকার। সকল বঞ্চনা ও গঞ্জনা নারীকেই সইতে হয়। ক্ষমতার আঁধারে নারী অসহায় জীব। পুরুষ

বরাবরই সুবিধা ভোগী সাহিত্যে কিংবা ব্যক্তিজীবনে-পুরুষ ব্যাখ্যা করেছে নিজেকে নিজেরেই অঙ্গ বাঁচিয়ে। ফলে নারীর বিশেষ অঙ্গ ভিজলে রসিকতা করেছে পুরুষ; নারী শিক্ষিত হলেও আজো প্রতিবাদের ভাষা ক্ষীণ, মোলায়েম। কিন্তু সময়, যুগ ও পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় রাধার প্রতিবাদ উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র। রাধা কৃষ্ণের কাছে খবর পাঠানোর জন্য দূতও নিয়োগ করে করুন সুরে বলে উঠে- “মাথার বেণী খুলে দিবো, তারে আইন্যা দে।” রাধার এমন সাহসী, প্রতিবাদী, সমাজরে প্রতি ভ্রুকুটি নিক্ষেপ তথা পুরুষশাসিত সমাজরে প্রতি অভিশাপ। রাধার এমন ক্ষমতার ব্যবহারকে কেইট মিলেটের (১৯৬৯) “সেক্সুয়াল পলিটিক্স” এর দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। অথ্যাৎ যৌনতার সম্পর্ককে যে লৌকিক রাজনীতির দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেছেন, সেখানে স্বামী, ডাকিনী শ্বাশুড়ি, ও নাগিনী ননদী থাকা সত্ত্বেও রাধা পরকীয়া প্রেমের স্বপক্ষে যে বলিষ্ঠ ও দৃঢ় উচ্চারনে প্রেমিক প্রবর শ্যামের সাথে মিলনের অভিপ্রায় কি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ? যদি যুক্তির খাতিরে মেনে নেই, রাজনীতির মূলকথা-ক্ষমতা। যা নিয়ন্ত্রণে ও ভোগে একচ্ছত্র অধিপতি-পুরুষ। তাহলে তো বলতেই হয় আজকের নারীর ক্ষমতায়নের ঝাণ্ডা উত্তোলনের যাত্রার মহারথ উদ্বোধন করেছিল রাই বিনোদিনী। যে কিনা সেই পুরুষালি ক্ষমতাকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শনে নিজস্ব বিশেষ অঙ্গের বর্ণনা করেছেন অনায়াসে যেখানেই নিহিত রয়েছে নারীমুক্তির; গ্রোথিত আছে শুচিতা বা সতীত্বের কীট। আজকের যুগের সকল নারীবাদী তত্ত্বগুলো অন্ততঃ তাই বলে। অথচ ঐতিহাসিকভাবে নারী মুক্ত ছিল; গর্ভধারন, শ্রমবিভাজন কিংবা কৃষির প্রসার নারীকে বন্দিনী করে ফেলেছে। তাই নারীর মুক্তি তব অঙ্গে ।

চিরায়ত মুক্ত থেকে বন্দী: নারীর মুক্তি তব অঙ্গেঁ?

লালনের কন্ঠে যখন ধ্বনিত হয়- “রবেনা এ ধন, জীবন ও যৌবন, তবে কেন মন এতো বাসনা।” এ গানে ষড়রিপুর প্রথম রিপু কামের কথা মনে করিয়ে দেয়। যে ষড়রিপুর কথা বলা হয়েছে -কাম কিংবা যৌনতা হলো প্রথম ও প্রধান। বলা হয়ে থাকে যে, এই কাম বা যৌনতা মানুষের অনিষ্টের মূলে থাকে। গ্রামীন বাংলায় প্রচলিত ছড়া- “আও, বাও, নারী, এই তিন হলো পড়ার বৈরী।” অর্থ্যাৎ কথা, শব্দ এবং নারী- এই তিন পড়াশোনার জন্য খুবই ক্ষতিকর। পড়াশোন করে যদি কেউ উন্নতি- করতে চায় তবে তাকে এই তিন শত্রু হতে দূরে থাকতে হবে। সে যাই হোক, নারীর মূলে যে কাম-একে কাজে নেশা বা পেশা হিসেবে বিবেচনা করলেও মানব সৃষ্টির মূলে আছে এই কামযন্ত্র। তাই তো লালনের কন্ঠে আমরা শুনতে পাই “চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছ, আমরা ভেবে করবো কী? ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম,তাকে তোমরা বলো কি।”আদি শুক্রানু ও ডিম্বানুর যে সম্মিলিন, যে প্রক্রিয়ায় সন্তান পুনরৎপাদন তাকে লালন সাঁইজি বলেছেন চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে। দুই চাঁদের মিলনে- ছেলে বা মেয়ে কি হবে সেটা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য জ্ঞান। ফিরে যাই গানের কথায়- সন্তান বা মেয়ের সন্তান জন্মদানের পূর্বে এলাকা ভেদে তাকে কন্যা/ঝি বলে বিবেচনা করা হয়। আর যখনই কন্যা/ঝি সন্তান জন্মদান করে. তখন তাকে মা বলে অভিহিত করা হয়। এই মা কিংবা মাতৃত্বদানের প্রক্রিয়ায় ওতোপ্রতোভাবে জড়িত যৌনতা। অথচ এই যৌনতা সংক্রান্ত আলোচনা সমাজে অপ্রত্যাশিত আলোচনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে এটা কুর্তকও বটে অথচ এর প্রয়োজন ও প্রয়োগ অবশ্যাম্ভাবীভাবে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জাতি বিনির্মানে।
যদিও সামাজিক বিজ্ঞানে মনে করা হয় “কেউ নারীরূপ জন্ম নেয় না বরং হয়ে উঠে নারী। সমাজে যে নারী দেখা যায়-কোনো জৈব, মনস্তাত্ত্বিক বা অর্থনৈতিক ভাগ্য তার রূপ স্থির করে না (বেভোয়ার-১৯৪৯)।” তাই, সৃষ্টিকাল বা চিরায়ত কাল হতে চলে আসা নারী আমাদের কাছে একখন্ড মাংস বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।পুঁজিবাদ ক্রমশঃএ ধারনাকে ত্বরান্বিত করেছে তার প্রসার ও প্রচারের স্বার্থে। তাই নারীর যৌন অঙ্গঁ প্রত্যঙ্গগুলো ঢাকা রহস্যে

আর নিষেধে কিন্তু অর্থনীতি এ দুয়ের সুযোগ গ্রহণ করেছে বাণিজ্যিকায়ন নামকরনের মাধ্যমে। ফলে, রহস্যময়তায় পরিপূর্ণ,আর আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো সম্পর্কে জানা ও জানানোও নিষেধ মূলতঃ নিম্নবর্গীয় ও মধ্যবিত্ত দর্শনে-কিংবা অপরাধ আমাদের হাল সমাজের এ বাস্তবতায় বিজ্ঞাপন তা উন্মুক্ত করে পসরা সাজিয়ে রেখেছেন আমাদের চোখের সামনে। নারীর একটি অঙ্গ স্তন যার বাহারি প্রদর্শন-অধিকাংশ পুরুষের চোখে এর আবেদন তীব্র বলে ধরা হয়। যুগে যুগে এ অঙ্গের বর্ণনা করেছেন সকল কবি-সাহিত্যিকগণ। তাঁরা নারীর প্রত্যেক অঙ্গের অবারিত রূপ ও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেছেন অকৃপণভাবেই। কবি এ্যান্ডু মার্ভেলের মতে’ প্রত্যেক স্তনের বর্ণনায় লাগে দু’শো বছর (রাবেয়া মঈন:১৯৮৯:০৮)।” আর বাংলা সাহিত্যে এ স্তনের উপর হয় পিএইচডি এবং গ্রণ্থাকারে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা বিমোহিত নারী গবেষকের দৃষ্টিতে বক্ষ বন্দনা তাইতো রমনীর গৌরবের বক্ষ, কালে কালে কবি- সাহিত্যিকগণের বক্ষ বিষয়কে গবেষণার ব্যাপক অবকাশ রয়েছে বলে মনে করা হয় (রাবেয়া মঈন:১৯৮৯)।

যাই হোক, নারীর যৌন অঙ্গগুলো প্রধানত: দুই ভাগে বিভক্ত। যথা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরিক। নারীর বাহ্যিক যৌন প্রত্যঙ্গ এলাকার নাম যৌনাঞ্চল বা ভালভা। আপ-লিনিয়ের এ এলাকাকেই বলেছিল ” বিশুদ্ধ ত্রিভুজ”। পুরুষ দক্ষতার সাথে খুঁজে এ ত্রিভুজ আর অভিজ্ঞ অথবা দক্ষতার অভাবেই এখানে আগুন জ্বলে অনুপস্থিতির কারনেও।
রাধার কোন অঙ্গঁ জ্বলে যায় বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা বা ধারণা না পাওয়া গেলেও সহসাই অনুমান করা যায় এটি একটি ত্রিভূজ এবং এ অঙ্গেঁর বিশেষ বিবরণ আমরা পাই- হুমায়ুন আজাদের (২০১১) এবং পৃথ্বীরাজের (১৪০৭ বঙ্গাব্দ) লেখায়। উক্ত গ্রণ্থ সমূহ হতে তুলে ধরা হলো পাঠকের মর্মের উপলব্ধির জন্য যাতে অন্তরে শুনতে পান এর ধ্বনি, প্রতিধ্বনি যাত করে অনুরণিত হবে হৃদয়ের স্পন্দন। ”নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো ঢাকা রহস্যে আর নিষেধে। নারীর শরীর যেনো আকর্ষণীয় রহস্যময় ভীতিকর দূর্গ যার সংগঠন সে নিজে জানে না; জানাও নিষেধ। আজো মানুষের সবচেয়ে বড়ো ট্যাবু নারীর শরীর।

তার একটি প্রত্যঙ্গ, স্তন, দৃষ্টিগ্রাহ্য; অধিকাংশ সংস্কৃতির পুরুষের চোখে ওটির আবেদন তীব্র, যদিও আদিম সমাজের পুরুষের চোখে ওর কোনো আবেদন নেই। তবে নারীর অধিকাংশ যৌন প্রত্যঙ্গ দেহাভ্যন্তর ও অদৃশ্য, আর যেগুলো বাহ্যিক সেগুলোও অন্তরালবর্তী। একটি নগ্ন নারী দিকে তাকিয়ে থেকেও তার কোনো যৌনপ্রত্যঙ্গ দেখা যায় না, শুধু আভাসের ঢেউ উঠতে থাকে। বালক শিশুর শিশ্নটি বাইর থেকে দেখা যায়, ‘কী মিষ্টি’ ব’লে ওটি নিয়ে তার পিতামাতারা খেলাও করে, ওটিকে দেয় নানা প্রিয় ডাকনাম;- সোনা, নুনু, ধন; কিন্তু বালিকার বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গের কোনটি কেমন, কোনটির কী নাম ও কী কাজ তা জানতে দেয়া হয় না বালিকাকে, জানতে চাইলে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। যেনো ওগুলো অপার লজ্জার, ঘৃণার, অপরাধের, এমনকি পাপের। তাই নারী শৈশব থেকেই বিব্রত থাকে তার যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো নিয়ে। এগুলো তার লজ্জা, লজ্জাস্থান; ওগুলো দেখতে নেই, দেখাতে নেই, ছুঁতে নেই, ছুঁতে দিতে নেই, ওগুলোর নাম নিতে নেই। অনেক ভাষায় বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোকে বলা হয় ‘লজ্জাস্থান’, এগুলোর চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পরিভাষা হচ্ছে ‘পুডেনডাম’ অর্থাৎ লজ্জার বিষয়। প্রথাগত লজ্জা, ঘৃণা, পাপ আর অপরাধবোধের সাথে আরেকটি দুর্নাম জড়িত করে দিয়েছেন ফ্রয়েড; তিনি নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোকে দেখেছেন বিকলাঙ্গতা হিসাবে। নারীর শিশ্ন নেই, রয়েছে ভগাঙ্কুর; তাই নারী বোধ করে শিশ্নের অভাব, ভোগে খোঁজাগূঢ়ৈষায়, নিজেকে মনে করে বিকলাঙ্গ পুরুষ, এসব বাজে ধারণা তিনি যুক্ত করে দিয়েছেন নারী যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোর সাথে। এসবের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। নারীর যৌন প্রত্যঙ্গগুলো নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গ, ওগুলো একশো ভাগ স্বাভাবিক; আর ওগুলো লজ্জা, অপরাধ, ঘৃণা বা পাপের ব্যাপার নয়। তবু কোনো নারী নির্দ্বিধায় ছুঁতে পারে না তার প্রত্যঙ্গ, কেননা ওগুলো নিষিদ্ধ। প্রতিটি নারীর জানা উচিত তার আভ্যন্ত ও বাহ্যিক প্রত্যঙ্গগুলো, তবে শুধু অশিক্ষিত নারীরাই নয়, শিক্ষিত নারীরাও জানে না তাদের প্রত্যঙ্গগুলোকে ও সেগুলোর ক্রিয়াকলাপ। শৈশব থেকে তাদের বার বার দেখা দরকার নিজেদের প্রত্যঙ্গগুলো, বিশ্বাস করা দরকার যে ওগুলো কোনো নিষিদ্ধ বস্তু নয়। ওগুলো নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকার জন্যে প্রকৃতি ওগুলো দেয়নি নারীকে।

নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোর কয়েকটি বাহ্যিক, কয়েকটি অভ্যন্তরিক। তবে এগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে নগ্ন হলেও, স্তন ছাড়া, নারী কখনো নগ্ন নয়। নারীর বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গ এলাকার নাম যৌনাঞ্চল (ভালভা)। চমৎকার এলাকা এটি, আপলিনিয়ের এ-এলাকাকেই বলেছিলেন ‘বিশুদ্ধ ত্রিভুজ’। এ-এলাকায় রয়েছে কয়েকটি প্রত্যঙ্গ, যেগুলো পালন করে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব। এগুলো নারীর বাইরের যৌনপ্রত্যঙ্গ, কিন্তু বাহির থেকে দেখা যায় না, দেখার জন্যে তাকাতে হয় কাছ থেকে, দেখতে হয় আঙ্গুল দিয়ে ফুলের পাপড়ির মতো নেড়ে নেড়ে।” আজাদ এবং পৃথ্বীরাজ উভয়ে নিখুতঁভাবে বিবরণ দিয়েছেন যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।
বৃহদোষ্ঠ: এটি হচ্ছে দু-ভাঁজ চামড়া: ঠোঁট যেমন মুখগহ্বরকে ঢেকে রাখে এ-দুটিও ঢেকে রাখে এ-দুটির মধ্যবর্তী ভগগহ্বরকে। দুটি বড়ো মোটা গোলাপপাপড়ি ব’লে মনে হ’তে পারে এ-দুটিকে। শিশু ও বুড়োকালে বৃহদোষ্ঠ দুটি থাকে ছোটো, ভেতরে মেদ থাকে না, তবে বয়ঃসন্ধি থেকে ঋতুবন্ধ হওয়া পর্যন্ত বৃহদোষ্ঠ থাকে পরিপুষ্ট। ওপরের দিকে বৃহদোষ্ঠ দুটি মিলিত হয় এক মেদপুষ্ট অঞ্চলে, যাকে বলা হয় ভেনাসের পাহাড় [মোন্স ভেনারিস] বা যোনি বিটপ। বৃহদোষ্ঠ, বিশেষ ক’রে মোন্স ভেনারিসের ওপর উদগত হয় যৌনকেশ।
ক্ষুদ্রোষ্ঠ: এ-দুটি মেদপুষ্ট স্পর্শকাতর চামড়ার ভাঁজ, গোলাপের ছোটো পাপড়ির মতো। ওপরের দিকে এ-দুটির একটি চলে যায় ভগাঙ্কুরের ওপরে, আরেকটি ভগাঙ্কুরের নিচে; নিচের দিকে এ-দুটি মিলিত হয় পরস্পরের সাথে। বয়ঃসন্ধি থেকে ঋতুবন্ধ পর্যন্ত এটি গুপ্ত থাকে বৃহদোষ্ঠের আড়ালে, দেখতে হয় আঙুল দিয়ে খুলে; তবে শিশু ও বুড়োকালে এ-দুটি বেশ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে।
ভগাঙ্কুর: পুরুষের যেমন শিশ্ন নারীর তেমন ভগাঙ্কুর; তবে শিশ্নের যৌন ছাড়া অন্য কাজ রয়েছে, কিন্তু ভগাঙ্কুরের একমাত্র কাজ যৌনসুখ অনুভব। তাই এটি অনন্য কামপ্রত্যঙ্গ, পুরুষের এমন কোনো অনন্য কামপ্রত্যঙ্গ নেই। এটি যেহেতু শুধু কামসুখের জন্যেই, আর কোনো কাজের জন্যে নয়, তাই দেশে দেশে পিতৃতন্ত্র এর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে এটি কেটে ফেলার বিধান দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক মুসলমান দেশে এখনো ভগাঙ্কুরছেদ বা নারীর খৎনা প্রচলিত রয়েছে। এটি কেটে ফেলার অর্থ হচ্ছে নারীর কামসুখের

চিরাবসান। গত কয়েক দশকে নারীবাদীরা, ও জনসনের গবেষণা, প্রতিষ্ঠা করেছেন এর প্রাধান্য। তাঁদের মতে অরগাজম বা পুলকের জন্যে সঙ্গম অপ্রয়োজনীয়, এটি মৈথুন ক’রেই অনুভব করা সম্ভব চরম পুলক। ইলিয়েরসেন “আমি অভিযোগ করি” (১৯৬৯) নামের বইতে লিখেছেন (দ্র. গ্রিয়ার (১৯৭১, ৪৩)- (যৌনবিজ্ঞানীরা) পরামর্শ দেন যে সঙ্গমের অবতরণিকা হিসাবে নাড়তে হবে ভগাঙ্কুরটিকে,সঙ্গমকেই অধিকাংশ পুরুষ মনে করে ‘আসল জিনিশ’। তাদের জন্যে যা ‘আসল জিনিশ’,নারীর জন্যে তা পুরোপুরি সুখানুভূতিহীন এখানেই পুরুষ শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে জয়ী হতে চায়। এটিই হচ্ছে মূল জিনিশ! যাকে বিনীত, লজ্জাশীল ও অনুগত নারীরা শতো শতো বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছে। এটি অবস্থিত যৌনাঞ্চলের ওপরের দিকে মধ্যস্থলে। এটি মোটা শিউলিবোঁটার মতো, এর রয়েছে তিনটি অংশ: শীর্ষ, শরীরদন্ড, ও পা। এর শীর্ষটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, দন্ডটিও বেশ স্পর্শকাতর। শীর্ষ ও দন্ড নেড়েই নারী পেতে পারে চরম পুলক। সঙ্গমে নারী পুলক বোধ করে প্রধানত শিশ্নের সাথে এটির ঘর্ষণে। অনেক নারী সঙ্গমে কোনো পুলক বোধ করে না, কিন্তু তারা ভগাঙ্কুর মৈথুন ক’রে চরম পুলক লাভ করে।
যোনিচ্ছেদ: মূত্ররন্ধ্রের নিচে অবস্থিত নারীর যোনিমুখ, যেটি সাধারনত ঢাকা থাকে একটি পাতলা পর্দায়। পর্দাটির প্রথাগত নাম সতীচ্ছদ, তবে এটি থাকা-না-থাকা তথাকথিত সতীত্বের প্রমান-অপ্রমান নয়। সতীত্ব ব’লে কিছু নেই; এটি না থাকার অর্থ এটি নেই। এটিকে যোনিচ্ছদ বলাই ভালো। এটি এক অপ্রয়োজনীয় জিনিশ। এটি একটি পাতলা পর্দা, যাতে থাকে এক বা একাধিক ছিদ্র, যার ভেতর দিয়ে নিঃসৃত হয় ঋতুসাব। এটির আকার ও স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন হয়ে থাকে নারী থেকে নারীতে; সঙ্গম না করেও এটি ছিঁড়ে যেতে পারে, আবার বহুসঙ্গমেও থাকতে পারে অটুট। এটি ছেঁড়ার সময় সাধারণত কিছুটা রক্ত বেরোয়। অনেক সমাজে যোনিচ্ছেদ ছেঁড়া ও রক্তক্ষরণকে মনে করা হয় নারীর সতীত্বের প্রমাণ।
নারীর আভ্যন্তর যৌনপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে যোনি, জরায়ু, ডিম্বনালি বা ফ্যালোপীয় নালি, ও ডিম্বাশয়।
যোনি: এটি পুরুষের প্রধান স্বপ্ন ও একই সাথে দুঃস্বপ্ন। পুরুষ এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এমনকি ভয় পায় ও ঘৃণা করে এটিকে। যোনি

একটি পেশল নালি, এটি পেছনের দিকে উঁচু হয়ে গিয়ে জরায়ুতে পৌঁছে। এটি পেশিতে গঠিত, এবং এতে আছে রক্তবাহী শিরাজাল, যা কামোত্তেজনার সময় ফুলে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে যোনির দেয়াল লেগে থাকে পরস্পরের সাথে; তবে এটি যেহেতু স্থিতিস্থাপক, তাই এর ভেতর দিয়ে লিঙ্গ বা ট্যাম্পুন প্রবেশের বা সন্তান প্রসবের সময় এটি বিস্ময়করভাবে প্রসারিত হয়। যোনি সাধারণত ৩.৭৫ ইঞ্চি দীর্ঘ। জরায়ুর গ্রীবা বা সারভিক্স ঢুকে পড়ে এর ভেতর। যোনি প্রত্যঙ্গ হিসেবে বিস্ময়কর। এটা শুধু স্থিতিস্থাপকই নয়, এটির আছে নিজেকে নিজে পরিচ্ছন্ন রাখার শক্তি।নারীর আভ্যন্তর প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে এটিই বেশি লিপ্ত হয় কামে; সাধারণ বোধে এটিই নারীর একমাত্র কামপ্রত্যঙ্গ। পুরুষ এটির ভেতরে শিশ্ন ঘর্ষণ ও ধাতুপাত করেই চরম সুখ পায়। এটির সব অংশ সমান স্পর্শকাতর নয়, এর মধ্যভাগের কোনো স্পর্শকাতরতাই নেই, শুরু ও শেষভাগের রয়েছে কিছুটা স্পর্শকাতরতা। তাই শুধু এটির ভেতরে সঙ্গম করা হলে নারী পুলক বোধ করে না অথচ পুরুষ এটা বুঝতেই চায়না। ছোটো যোনি বলে কিছু নেই, যে কোনো যোনিতে প্রবেশ করতে পারে যে-কোনো শিশ্ন। কামোত্তেজনার সময় যোনি সিক্ত হয়, সিক্ততা শিশ্নের প্রবেশের সহায়ক। যোনি কোনো অক্রিয় প্রত্যঙ্গ নয়, সঙ্গমের সময় এটি শিশ্নকে জিভের মতো চুষতে পারে।
জরায়ু: জরায়ু আরো বিস্ময়কর। গর্ভধারণের আগে এটি দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো, দৈর্ঘে প্রায় চার ইঞ্চি, পাশে আড়াই ইঞ্চির মতো, ওজন দু-আউন্স। গর্ভধারণের সময় এটির ওজন হয় আড়াই পাউন্ড, ধারণ করতে পারে সতেরো ইঞ্চি দীর্ঘ একটি শিশু। সন্তান জরায়ুতে উদ্ভূত হয় না, লালিত হয়। জরায়ু এক শূন্য পেশল আধার, এর সামনে মূত্রাশয় পেছনে মলাশয়।
প্রেম ও কাম এবং চিরায়ত নারী তিনটিই পরস্পরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। নারীকে কাপড় পড়িয়েছে পুরুষ তার যৌনতার স্বার্থেই। আবার অল্প, স্বল্প বসনায় ভূষিত করে বাণিজ্যিক স্বার্থ কাজে লাগিয়েছে অর্থনৈতিক তথা পুঁজিপতিদের স্বার্থে। সুতরাং প্রেম ও কাম পরস্পর সম্পর্কিত হলেও দুটিই নারী পুরুষের জীবনে বিশেষ পাঠ প্রবল ভাবে দেখা দেয়; যদিও জীবনে দুটির গুরুত্ব সমান নয়। প্রেম স্বল্পায়ু, মানুষ প্রেমে বাচেঁনা

কিন্তু কাম ছাড়া চলেনা। বলা হয় প্রেম- জোয়ারের ন্যায় বিশেষ বিশেষ সময়ে দেখা যায় বা উপলব্ধি করা হয় মাত্র। এ কারণে বলা হয় যে, যাকে চাই তাকে না পাওয়া প্রেম, তাকে পাওয়া কাম। প্রেম পুরুষের জীবনের একটি অংশ হলেও তা নারীর সমগ্র অস্তিত্ব। তাহলে প্রশ্ন আসে রাধার জীবনে কোনটি? নাকি দুটোই ঘটেছে? সূত্রানুসারে কৃষ্ণ প্রথমে রাধারে না পেলে তা প্রেম বলে ধরা যেতো। কিন্তু রাধার সম্মতিতে তা মিলনও ঘটে যমুনার কূলে। অতঃপর কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধা পুনরায় প্রেমে জ্বলতে থাকে। ফলে নারীর জীবনে প্রেম ও কাম সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে, তাই এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে কথা-উপকথা প্রচলিত রয়েছে তা জৈবিক নয় বলে মতামত পাওয়া যায় বরং এ সকল সম্পর্ক সামাজিক পরিস্থিতির পরিণতি বা স্বীকার। এহেতু, উদাহরণ হিসেবে পরকীয়া প্রেমকে এরকম সামাজিক সম্পর্কের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

নিটশের মতে- “পুরুষ ও নারীর কাছে একই শব্দ “প্রেম” বোঝায় দুই জিনিস। নারী প্রেম বলতে যা বোঝে তা খুবই স্পষ্ট তা শুধু ভক্তি নয় তা প্রত্যাশাহীন নিঃশর্ত সম্পূর্ণ দেহমন সমর্পন। অর্থ্যাৎ যৌনতার অবাধ বিচরণ।
আজাদ (২০০০) উল্লেখ করেন-নারীর কাম সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রে দুটি বিরোধী ধারণা পোষণ ও প্রচার করা হয়। একটি হচ্ছে-নারীর কাম ক্ষুধার শেষ নেই; কিছুতেই এই আগুন নিভানো যায়না। অন্যটি হচ্ছে নারী কাম পছন্দ করেনা। নারী প্রাকৃতিকভাবে এক পুরুষেই পরিতৃপ্ত। পরকীয়া বা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ক্ষেত্রেই প্রথম ধারণাটাই যুক্তিযুক্ত বলে প্রয়োগ করা যায়।
কিন্তু দ্বিতীয় ধারনার স্বপক্ষে আমরা নজরুলের পূজারী কবিতায় পাই এভাবে-
“এরা লোভী, এর দেবী
যত পূজা পায়, চায় তত আরো
একজনে সুখী নয়, যাচে বহু জন।”
আদি পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ককে বুঝতে সহায়ক প্রথম ধারণাটি। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, নারীর-কাম সমভাগেই আপত্তি নাই। তবে, পুরুষতন্ত্রের ন্যায় অধিকাংশ নারীই তা স্বীকার করেনা। রাধাকে

আমরা তথাগত বিপ্লবী ও যৌন প্রতিবাদী বিবেচনা করে বলতে পারি যে, বাখোফোনের তত্ত্বের নাকচতাকেই ইতিপূর্বে অসাড়তা বলে রাধা, নারী মুক্তি জন্য যৌনমুক্তির যে আন্দোলন শুরু করে ছিলেন; তার উত্তরসূরীরা এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে নারীর মননে পৌরুষতান্ত্রিক মনোভাব লালন ও পালনে। ফলে, নারীর মুক্তির মূল ক্ষেত্রকে আঘাত করা বাদ দিয়ে নারীর মুক্তি তাই বেশীদূর এগোয়নি। কারণ যেখানে পুনরৎপাদন জড়িত, সেখানেই নারীর বিনির্মান সম্ভব নয় বলে এই মহীয়সী নারী বার্তা দিয়ে গেছেন কয়েক হাজার বছর পূর্বে। তাইতো, আমরা এ সময়ের তাত্ত্বিকদের লেখায় পাই-ক্যাথেরিন ম্যাককিনন (১৯৮২:১)এ-“মার্ক্সবাদে যেমন শ্রম,নারীবাদে তেমন কাম: যা মানুষের একান্ত আপন, কিন্তু তা হরণ করা হয়েছে সবচেয়ে বেশী।” কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমাদের নারীবাদীরা নারীমুক্তির জন্য এই কামের বা যৌনতার বিযুক্ত সম্পর্কের কথা বলেছেন খুবই কম। অথচ নারীর যৌন ও আবেগগত প্রবণতা গভীর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার চেতনা ও সৃষ্টিশীলতাকে (আজাদ (২০০০)। [নারী মুক্তির জন্য নারীবাদী কথাগুলো- (আজাদ:২০০০)। নারীপুরুষ কেউ অসম নয়, তাদের কারো ভূমিকা কম মূল্যবান নয়; তাদের উভয়ের ভূমিকাই সমান মূল্যবান, তবে তাদের ভূমিকা ভিন্ন। তারা সমান, তবে পরস্পরের পরিপূরক। রক্ষণশীলেরা মনে করেন নারী ও পুরুষের ভূমিকা ভিন্ন; ভিন্ন ভূমিকা ঠিক মতো পালন করাই তাদের সার্থকতা। তাঁরা শুধু নারীপুরুষের ভিন্নতা ও ভিন্ন ভূমিকায় বিশ্বাস করে না,তাঁরা মনে করেন সমাজরাষ্ট্রে বিধিবিধান প্রবর্তন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভিন্নতা। তাঁরা বিশ্বাস করেন নারীপুরুষের সহজাত ভিন্নতায় ও অসাম্যে; পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বে, নারীর নিকৃষ্টতায়। তাঁরা মনে করেন নারীপুরুষ একই কাজের উপযুক্ত নয়,নারী উপযুক্ত নিকৃষ্ট কাজের, তাই সেগুলোই পালন করবে নারী। তাঁদের চোখে এটা অন্যায় তো নয়ই, বরং এটাই ন্যায়সঙ্গত; কেননা নিকৃষ্টকে নিকৃষ্টরূপেই রাখাই ন্যায়। নারীপুরুষ সমান, তাদের অধিকার অভিন্ন-এ হচ্ছে নারীবাদ। একে মনে হয় সরল, দিবালোকের মতো স্বচ্ছ, সত্য বলে। কিন্তু পিতৃতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে মানা হয়নি এ সরল সত্যটুকু। নারীবাদীরা মনে করেন মৌল যৌগ্যতায় কোনো পার্থক্য নেই নরনারীতে; নারী ও পুরুষের মূল

পরিচয় তাদের স্ত্রী বা পুংলিঙ্গ নয়, তাদের মূল পরিচয় তারা মানুষ।মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা লিঙ্গনিরপেক্ষ। কিন্তু পিতৃতন্ত্র এটা মানে নি। নারীবাদীদের বিদ্রোহ নারীপুরুষের অসাম্যের ধারণা ও অসম অধিকারের বিরুদ্ধে; তাঁরা মনে করেন প্রথাগতভাবে নারীপুরুষকে যে মনে করা হয় অসম বলে, এবং নারীদের যে রেখে দেয়া হয়েছে নিম্নতর সামাজিক অবস্থানে, তা অন্যায়। তাঁরা সবাই মনে করেন পরিবর্তন ঘটাতে হবে এ-ব্যবস্থার, তবে কী পরিবর্তন ঘটাতে হবে, সে-সম্পর্কে তাঁরা পোষণ করেন নানা মত। নারীমুক্তির জন্যে কী কৌশল নিতে হবে, সে-সম্পর্কেই শুধু তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন না; তাঁদের ভিন্নতা আরো গভীর স্তরের। নারীর প্রকৃত স্বার্থ কী, কি হ’লে প্রকৃতই মুক্ত ঘটবে নারীর, এ সম্পর্কে বিভিন্ন নারীবাদী তাত্ত্বিক দেন বিভিন্ন মত। নারীবাদে চোখে পড়ে বেশ কয়েকটি তত্ত্বাদর্শ, প্রতিটিই বিশ্বাস করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে দরকার নারীর স্বাধীনতা ও পুরুষের সাথে সাম্য; কিন্তু বিভিন্ন মৌল বিষয়ে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নানা ভিন্নতা। প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্য কী, মানুষ বা নারীর প্রকৃত স্বভাব বা প্রকৃতি কী, রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী হবে, এসব বিষয়ে তাঁদের মধ্যে রয়েছে দার্শনিক ভিন্নতা। নারীমুক্তি সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্বাদর্শ রয়েছে; এগুলো হচ্ছে ‘রক্ষণশীল মতবাদ’, ‘উদার (মানবতাবাদী) বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীবাদ’, ‘মার্ক্সীয় নারীবাদ’, ‘আমূল নারীবাদ’। রক্ষণশীল মতবাদটি নারীর মুক্তিবিরোধী, এটি ছাড়া অন্যগুলো বিশ্বাস করে নারীমুক্তিতে।
রক্ষণশীল মতবাদ-এটি নারীমুক্তির বিরোধী, এটি পোষে প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস যে নারী যেভাবে যে অবস্থানে আছে, তাই ঠিক। নারীবাদের লড়াই এ-মতবাদের বিরুদ্ধেই। এ মতবাদে মিলে পিতৃতন্ত্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে: ধর্মগ্রন্থ, আইন, দর্শন সবখানেই এ-মতবাদ ছড়িয়ে আছে। এ-মতবাদ অনুসারে নারীরা যে- অসাম্য ভোগ করছে, তা অন্যায় ন্যায়; এই চিরন্তন শাশ্বত। রক্ষণশীলদের মতে কোনো কোনো নারী পোহায় নানা দুর্ভোগ, তবে সমাজ নারীদের সুপরিকল্পিতভাবে পীড়ন করে না।

রক্ষণশীলেরা মনে করেন নারীর যে অবস্থা, তা প্রকৃতিনির্ধারিত, বা বিধাতার নির্দিষ্ট; প্রকৃতি বা বিধাতাই ঠিক করে দিয়েছে যে নারীপুরুষ অসম; পুরুষ প্রভুত্ব করবে, নারী থাকবে তার অনুগত। এটা কোনো অন্যায় নয়, এটা ধ্রুব বিধান। রক্ষণশীলদের মধ্যে যাঁরা এতোটা বর্বর নন, তাঁরা একই কথা একটু মধুর করে বলেন।

উদার (মানবতাবাদী) বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীবাদ: এ-মতবাদের উদ্ভব ঘটে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ ওম্যান-এ (১৭৯২), এবং পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে জন স্টুয়ার্ট মিলের দি সাবজেকশন অফ উইমেন (১৮৬৯) নামক গ্রন্থে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে।
এ-মতবাদটিই এখনো প্রধান নারীবাদী ধারা, কেননা পশ্চিমের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের সাথে এটি বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। এ মতবাদের লক্ষ্য বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন করে সামাজিক রাষ্ট্রিকভাবে নারীর অবস্থান উন্নত করা। গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার; তাই এ মতবাদের মূলকথা হচ্ছে পুরুষ যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থির করে নিজের ভূমিকা, নারীকেও তেমনই দিতে হবে সমাজে প্রতিষ্ঠার ও নিজের ভূমিকা স্থির করার অধিকার। উনিশ শতকে এঁদের লক্ষ্য ছিলো ভোটাধিকার পাওয়া, কিন্তু তা পাওয়া সত্ত্বেও নারী আজো অনেক অধিকার পায় নি; কেননা রয়ে গেছে নানা আইন ও প্রথাগত বাধা। এসব বাধার ফলে নারী রাজনীতি, ব্যবসা, সামরিক ও অন্যান্য পেশায় সফল হ’তে পারছে না। উদার নারীবাদীদের দাবি হচ্ছে আইন ক’রে দূর করতে হবে এ-সমস্ত বাধা, প্রতিষ্ঠা করতে হবে সমান নাগরিক অধিকার। এ-মতবাদের বক্তব্য হচ্ছে কোনো ভূমিকায় প্রতিষ্ঠার জন্যে বিবেচনা করতে হবে শুধু ব্যক্তিকে, ব্যক্তির যোগ্যতাকে, আর করতে হবে শুধু ব্যক্তিটিকে। উদার নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্র যতো কম হস্তক্ষপে করে ততোই ভালো; তাই রাষ্ট্রের নারীর ওপর অভিভাবকত্বের কোনো দরকার নেই। নারীকে আগে থেকেই বিশেষ কোনো ভূমিকায় আটকে ফেলা অন্যায়; নারী সব ভূমিকায় নিজেকে পরখ ক’রে একদিন নিজেই দেখবে সে কোন ভূমিকার উপযুক্ত।

উদার নারীবাদ হচ্ছে প্রতিটি নারী ও পুরুষের নিজের ইচ্ছে ও শক্তি অনুসারে নিজের ভূমিকা বেছে নেয়ার অধিকার; স্বাধীনতা হচ্ছে নারীর নিজের ইচ্ছেমতো ভূমিকা অর্জনের পথে কোনো বাধা না থাকা। তবে এ-বিষয়ে পুরোনো ও আধুনিক উদার নারীবাদীদের মধ্যে মতের ভিন্নতা রয়েছে। আধুনিকদের মতে, আইন নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করতে তো পারবেই না, তার সাথে এমন আইন তৈরি করতে হবে যে সব রকম বৈষম্য অবৈধ। অসম বেতনহার নিষিদ্ধ করতে হবে, যে- সমস্ত পেশায় নারীবিরোধী আইন রয়েছে, সেগুলো অবৈধ করতে হবে, বিশেষ বিশেষ পেশায় নারী নিয়োগ না করে পুরুষ নিয়োগের যে-রীতি রয়েছে, তা নিষিদ্ধ করতে হবে। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে নারীর স্বার্থবিরোধী সকল আইন। আধুনিক উদার নারীবাদীরা অনেক ক্ষেত্রে নারীর পক্ষে বৈষম্য সৃষ্টির পক্ষপাতী। তাঁরা দাবি করেন, এতো দিনের বৈষম্য দূর করার জন্যে, এখন অনেক পেশায় পুরুষ না নিয়ে নিতে হবে নারী, এবং বাইরের কাজে অক্ষম নারীদের দিতে হবে বিশেষ ভাতা। যেমন: নারীদের দিতে হবে প্রসব ছুটি ও ভাতা। এটা দয়া নয়, নারীর প্রাপ্য; কেননা সন্তান জন্ম দেয়া একটি সমাজ সেবা। তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতবিরোধী আইনেরও বিরোধী, কেননা এগুলো ক্ষুন্ন করে নারীর অধিকার। শিশুপালনের ব্যাপারটিকে তাঁরা দেন বিশেষ গুরুত্ব। উদার নারীবাদীদের কাছে নারীস্বাধীনতা হচ্ছে নারীর সামাজিক ভূমিকা নিজে স্থির করার, এবং পুরুষের সাথে সমভাবে প্রতিদ্বন্দিতা করার অধিকার। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। তাঁরা মনে করেন না যে নারীমুক্তির জন্যে বদলে দিতে হবে সমগ্র সমাজসংগঠন; এও মনে করেন না যে সব নারী একই সময়ে লাভ করবে মুক্তি। তাঁরা মনে করেন সবাই মুক্তি পাওয়ার অনেক আগেই কোনো কোনো নারী মুক্তি পেতে পারে। তাঁরা মনে করেন নারীমুক্তি শুধু নারীরই মুক্তি ঘটাবে না, ঘটাবে পুরুষেরও মুক্তি; এতে পুরুষের কিছু অবৈধ সুবিধা কমলেও পুরুষ মুক্তি পাবে সংসারের ভরণপোষণ ও দেশরক্ষার দায়িত্ব থেকে।
মার্ক্সীয় নারীবাদ: এ মতবাদ অনুসারে নারীশোষণ, ঐতিহাসিকভাবে এবং বর্তমানে, ব্যক্তিমালিকানার ফল; তাই নারীকে মুক্ত করা

সম্ভব শুধু ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্ত ক’রে। মার্ক্সীয়দের মতে নারীমুক্তি-আন্দোলন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপক সংগ্রামের একটি অংশ। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অনেক কারণ রয়েছে, নারীবাদ ওই কারণগুলোর একটি। তাঁদের মতে নারী ও শ্রমিকের স্বার্থ একই, কেননা নারী ও শ্রমিক একই রকমে শোষিত। মার্ক্সীয় নারীবাদের উদ্ভব ঘটে এঙ্গেলসের পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (১৮৮৪) সন্দর্ভে। মার্ক্সবাদ অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকাংশ মানুষই শোষিত। কেননা উৎপাদনের উপকরণগুলো কিছু মানুষের অধিকারে। তারা উপকরণের জোরে আধিপত্য করে সমাজের অধিকাংশ মানুষের ওপর, যারা বেঁচে থাকার জন্যে সস্তায় বেচে দিতে বাধ্য হয় তাদের শ্রমশক্তি। নারীও এ শোষণের শিকার। মার্ক্সীয়রা স্বীকার করেন যে নারী শিকার হয় আরো বিশেষ কিছু শোষণের, পুরুষ যা থেকে থাকে মুক্ত। তবে শোষণের মূল রয়েছে পুঁজিবাদে, তাই পুঁজিবাদ উৎখাত নারীর জন্যে আরো বেশ জরুরী। মার্ক্সবাদ অনুসারে নারী বিশেষভাবে শোষিত হয় প্রথাগত পরিবারের জন্যে, নারী হচ্ছে পারিবারিক দাসী, কিংবা যৌনদাসী সে বাইরের কোনো উৎপাদনমুখী কাজ অংশ নিতে পারে না। একপতিপত্নী বিয়ে উদ্ভাবনই করা হয়েছিলো কতিপয়ের মুঠোতে ধন জড়ো করার উদ্দেশ্যে; ওই কতিপয় হলো পুরুষ। তাঁদের মতে পরিবার গঠিত হয়েছিলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। পুরুষই পরিবারে সার্বভৌম। এঙ্গেলসের (১৮৮৪: ২২৯) মতে, একপতিপত্নী বিয়ে নির্ভর ‘আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য অথবা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।’ তবে এ-বিয়ে নামে মাত্র একপতিপত্নী বিয়ে; এতে নারীকেই থাকতে হয় সতী, কিন্তু পুরুষের কাছে যৌনসততা চাওয়া হয় না বরং এ সংক্রান্ত চাওয়া অন্যায়। তাই শ্যাম নিরাপরাধ। রাধা হয়ে গেলো কলঙ্কিনি। মার্ক্সীয়রা বলেননা যে, নারীশোষণ পুঁজিবাদের সৃষ্টি; তবে তাঁদের মতে পুঁজিবাদ নারীশোষণকে বহুগুনে বাড়িয়েছে, এবং নারীকে অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁদের মতে পুঁজিবাদ আর পুরুষাধিপত্য অবিচ্ছেদ্য, একটি শক্তিশালী করে আরেকটিকে। এঙ্গেলস (১৮৮৪: ২২৯, ২৩০) বলেছেন, ‘সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিস্কৃত হয়ে স্ত্রীই হল প্রথম ঘরোয়া ঝি’, এবং ‘সামাজিক

উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রীজাতিকে আবার নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তি প্রথম শর্ত।’ তখন নারী আর স্বামীর ওপর ভরণপোষণের জন্যে নির্ভর করবে না, নারী স্বাধীন হবে। তবে এর জন্যে দরকার সমাজের মৌলিক রূপান্তর। নারী আজো যেসকল কাজ করে-ঘরকন্না, শিশুপালন সব কিছুকে নিয়ে আসতে হবে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে। তাঁরা মনে করেন নারীমুক্তির জন্যে দরকার পরিবার নামক ঐতিহ্যবাহী এ সংগঠনটির মৌলিক পরিবর্তন। এর জন্যে পরিবারের আর্থিক কাজগুলো পালন করতে হবে রাষ্ট্রকে; রাষ্ট্রই বহন করবে পরিবারের ভার। পুঁজিবাদ এ ভার নেবে না; এ ভার নিতে পারে শুধু সাম্যবাদ। তাই,শুধু সাম্যবাদের মধ্যেই নারী পেতে পারে প্রকৃত মুক্তি।
সেখানে আর পরিবারের মধ্যে স্বামীটি থাকবে না আর বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে আর স্ত্রীটি প্রলেতারিয়েত।
সাম্যবাদে ধ্বংস হয়ে যাবে ‘আর্থ একক’রূপে বিরাজমান একপতিপত্নীক পরিবার, তবে তা টিকে থাকবে ‘সামাজিক একক’ রূপে। সাম্যবাদেও বিয়ে থাকবে, তবে তা এখনকার মতো অর্থ চুক্তি থাকবে না; তখনও পরিবার থাকবে, তবে তা গড়ে উঠবে নারীপুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণে। তখন নারী ও পুরুষ হবে প্রকৃতই মুক্ত।
আমূল নারীবাদ-নারীপীড়নের সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করে একটি মূল ধারণা দিয়ে, সেটি হচ্ছে লৈঙ্গিক পীড়ন। উদার নারীবাদীরা মনে করেন নারীর সমস্যা রাজনীতিক সামাজিক অধিকারহীনতা, কিন্তু আমূল নারীবাদীরা তা মনে করেন না । মার্ক্সীয়দের মতো তাঁরা মনে করেন না যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজই নারীর দুরবস্থার মূলে। তাঁরা মনে করেন নারীর দুরবস্থার মূল কারণ জৈবিক: গর্ভধারণ করতে গিয়েই নারী মেনে নিতে বাধ্য হয় পুরুষের অধীনতা। তাঁদের মতে পরিবারের উৎপত্তি ঘটেছে জৈবিক কারণে, পরিবার একটি জৈব সংগঠন। তাঁরা মনে করেন ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে আদি ও মৌলিক পীড়ন হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক শারীরিকভাবে নারীকে নিজের অধীনে নিয়ে আসা। তাঁরা যেনো মনে করেন যে দেহই নারীর নিয়তি। তবে নারীকে মুক্তি পেতে হবে এ নিয়তি থেকে। তাঁরা মনে করেন জৈব পরিবারে যে শক্তির সম্পর্ক দেখা দেয়, তাই শক্তির মৌল কাঠামো। তাঁদের মতে জৈব পরিবারই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মূলে। তাঁদের মতে পুঁজিবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই গৌণ ব্যাপার, মূল লড়াই হচ্ছে লিঙ্গবাদের

বিরুদ্ধে লড়াই। আমূল নারীবাদী ভাবনার উন্মেষ বোভোয়ার, মিলেট, গ্রিয়ার ও আরো অনেকের মধ্যে দেখা যায়, তবে তা প্রবল রূপ পায় টাইগ্রেস অ্যাটকিনসন ও শুলামিথ ফায়ারস্টোনের লেখায়। তাঁদের মতে নারী-অধীনতা মূলত জৈবিক, তাই নারীমুক্তির জন্যে দরকার জৈবিক বিপ্লব। তাঁরা মনে করেন মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম প্রযুক্তিবিদ্যার এমন উন্নতি হয়েছে যে তার সাহায্যে নারীকে মুক্ত করা সম্ভব সন্তান ধারণ ও পালনের মৌলিক অসাম্য থেকে। তাঁরা মনে করেন গর্ভধারণ নারীর জন্য অবধারিত নয়, মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নারীর নয়। যদি মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হয়, তবে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে পুরুষকেও। নারী আর গর্ভধারণ করবে না, শিশুপালন করবে না; কৃত্রিম উপায়ে জন্ম দিতে হবে সন্তান, আর সমাজ বহন করবে তার পালনের দায়িত্ব।
এ মৌলিক পরিবর্তনের সাথে রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক প্রভৃতি গৌণ ব্যাপারেও বদল ঘটাতে হবে; নারীকে দিতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ অধিকার। তাঁরা মনে করেন সমাজের সমস্ত কাজে নারীকে সম্পূর্ণরূপে জড়িত করতে হবে, এবং দিতে হবে যৌন স্বাধীনতা। পরকীয়া যৌন স্বাধীনতা নয়; তবে নারী মুক্তির অনুষঙ্গ উপাদান মাত্র। তাঁদের মতে প্রযুক্তি শুধু নারীকে গর্ভধারণের দায় থেকে মুক্তি দেবে না, পরিশেষে তা মুক্তি দেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই কাজ করার দায় থেকে। প্রযুক্তি ধ্বংস ক’রে দেবে পরিবারের জৈবিক ও আর্থ ভিত্তি, বাতিল হয়ে যাবে পরিবার, নারীপুরুষের বিভিন্ন ভূমিকা ও শক্তির সম্পর্ক। তাঁরা মনে করেন নারীকে নিজের ভূমিকা বেছে নেয়ার অধিকার দেয়াই যথেষ্ট নয়; জৈবিক বিপ্লবের মাধ্যমে বিলুপ্ত করে দিতে হবে সমস্ত ‘ভূমিকা’। তাঁদের মতে জৈবিক পরিবার বিলুপ্ত হলে যৌন নিপীড়নও নির্যাতন লোপ পাবে বলে মনে করা হয়। তখন কে কার সাথে ও কোন ধরনের যৌনসম্পর্কে জড়িত হবে, তা স্থির করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রতিটি নরনারীর। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নারীর যে লড়াই,তা আর থাকবে না।তখন সমকাম-পুরুষের সাথে পুরুষের, নারীর সাথে নারীর-নিন্দিত থাকবে না, বিকল্প বলেও গণ্য হবে না; যে যার রুচি মতো বেছে নেবে বিশেষ ধরনের যৌন সম্পর্ক যেখানে ভালোলাগাটুকু কাজ করবে

শক্তিশালীরুপে। উদার নারীবাদীদের মতে সমকাম, বিষমকামের বিকল্প, মার্ক্সীয়দের মতে সমকাম পুঁজিবাদী বিকৃতি; আমূল নারীবাদীদের মতে এটা স্বাভাবিক। তাঁদের মতে জৈবিক বিপ্লবের ফলে ‘সমকাম’, ‘বিষমকাম’ প্রভৃতি ধারণাই লোপ পাবে; লোপ পাবে ‘যৌনসঙ্গম’ নামের সংস্থাটিও, যাতে নারী-পুরুষ পালন করে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা। সাম্য বলতে আমূলবাদীরা শুধু সুযোগসুবিধার সাম্য বোঝেন না, বোঝেন সন্তানধারণ না করারও সাম্য। তবে সন্তানকে ভালোবাসার অধিকার থাকবে উভয়ের। জৈবিক বিপ্লব বাস্তবায়িত হ’লে রাষ্ট্র লোপ পাবে; এর ফলে এমন মানুষ দেখা দেবে, যা আগে কখনো দেখা যায় নি। এ-বিপ্লব শুধু নারীকে মুক্ত করবে না, মুক্ত করবে পুরুষকেও; পুরুষ মুক্তি পাবে ভরণপোষণের ভার থেকে, কিন্তু তারাও সন্তান ধারণ ও লালনে পালন করবে সমান দায়িত্ব।
আমূল নারীবাদের একটি ধারা হচ্ছে ‘নারীসমকামী স্বাতন্ত্র্যবাদ’। তাঁদের মতে পুরুষাধিপত্য বিলুপ্ত করার উপায় হচ্ছে পুরুষের সাথে কোনো সম্পর্কে না আসা। তাঁদের একদলের মতে, এটা সাময়িক ব্যবস্থা; আরেক দলের মতে, এটা হবে সব সময়ের ব্যবস্থা। তাঁদের মতে কে কার যৌনসঙ্গী, এটা কোনো গুরুত্বের ব্যাপার নয়; তবে এখনকার পুরুষাধিপত্যবাদী সমাজে যৌনসঙ্গী নির্বাচনও রাজনীতি। তাই, পুরুষাধিপত্য প্রতিরোধ করার জন্যে নারী পুরুষকে প্রত্যাখান করে যৌনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে নারীকে। তাঁদের মতে বিষমসম্পর্কের ভেতরেই গোপন রয়েছে এমন বিশ্বাস যে পুরুষ প্রভুত্ব করবে নারীর উপর। অনেক নারীসমকামী স্বাতন্ত্র্যবাদী আবার প্রতিষ্ঠা করতে চান মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, কেননা তা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার থেকে উন্নত। যদিও সম-সাময়িককালে মার্ক্সীয় নারীবাদ কিছুটা ভিন্ন রূপ নিয়েছে, যা ধ্রুপদী মার্ক্সীয় নারীবাদের সাথে যুক্ত করেছে কিছু নতুনত্ব। তাঁরা সন্তানধারণে প্রস্তুত,এবং আমূল নারীবাদকে গণ্য করেন ইউটোপীয় ধারণা বলে। তাঁরা মনে করেন সাম্যবাদই নারীমুক্তির পূর্বশর্ত, তবে সাম্যবাদই যথেষ্ট নয়; কেননা সাম্যবাদী সমাজেও বিরাজ করতে পারে লিঙ্গবাদ। তাই নারীমুক্তির জন্যে বদলে দিতে হবে সামাজিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ রূপটিকেই।

যে কামে নারীর ভূমিকা প্রধানতঃ সক্রিয় (বেভোয়ার ২০১২:২৪২)। কিন্তু রাধার বক্তব্য তা মনে হয়না বরং রাধা আক্রমনাত্মক আচরনে কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুখ পাওয়ার জন্য চায় একটু প্রণয় স্পর্শ, ঘটাতে চায় প্রেমের কিংবা রসের সম্মিলন। নারীকে অর্ন্তমূখি হলেই ভালো মানায় এমন বক্তব্যের দৃঢ় উচ্চারনে রাধা ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তেজস্বী নারী, আক্রমনাত্মক, প্রাণোচ্ছল ও জীবন শক্তিসম্পন্ন এবং পৌরুষ শক্তি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যে দাবী করে যৌনতায় মুক্ত হবে নারী। বিমূর্ত এ নারীকে নিয়ে লেখার কাজ শুরু করেছেন অনেকেই, অনেক আগে থেকেই।
পরকীয়া প্রেমের একটি তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক ভিত্তি আমরা বেভোয়ার (২০১:২৫৭) এ পাই। আমরা এটাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিতে পারি না, তবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের শক্তিকে বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণও বটে। বেভোয়ার মনে করেন, যেহেতু পুরুষটি গ্রহণ করে নারীটিকে, তাই তার পছন্দ-অপছন্দ করার যথেষ্ট কারণ থাকে। কারণ পাত্রীর সংখ্যা অজস্র। কিন্তু যৌন কর্মকে যেহেতু নারীর ওপর ন্যস্ত থাকে একটি সেবামূলক দায়িত্ব বলে এবং এ সেবার উপর ভিত্তি করে তাকে বা নারীটিকে দেয়া হয় সুযোগ সুবিধা, তাই এটা যুক্তি সঙ্গত যে, সে উপেক্ষা করবে তার ব্যক্তিগত বিশেষ অনুরাগগুলো।বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ হিসেবে নারীর স্বাধীনতা অস্বীকার করা; কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া যেহেতু প্রেমও থাকতে পারেনা; ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যও থাকতে পারেনা। তাই নিজের জন্য আজীবন কোনো একটি পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ লাভের ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য তাকে ছেড়ে দিতে হয় একটি বিশেষ ব্যক্তির ভালোবাসা।” রাধা-কৃষ্ণ উভয়ে উভয়কে জানতো চিনতো ছোট বেলা থেকেই। উপকথা প্রচলিত যে, রাধাকে প্রথম প্রথম মনে করা হতো জন্মান্ধ। কৃষ্ণ যখন তার পালিত মাতার সাথে প্রথম রাধার বাসায় যান, তখনই সকলে খেয়াল করেন যে, রাধা সবকিছুই দেখছে। এবং তারা স্বত:স্ফুর্তভাবে খেলা করছে। তখন হতে মনে করা হয় যে, রাধা প্রথম দর্শনেই কৃষ্ণকে লাভ করে। তাই- আয়ান ঘোষ রাধার প্রেম হলেও হতে পারে কিন্তু কৃষ্ণ, ‘রাধার প্রথম ভালোবাসা’ দ্বিতীয়ত: প্রেম ও ভালোবাসা। অর্থ্যাৎ একটি মনোনীত সঙ্গীর সাথে ব্যক্তিগত

সম্পর্ক স্থাপন নারীর কাজ নয়, তার কাজ হচ্ছে সাধারণ ভাবে নারীধর্মী ভূমিকা পালন করা; তাকে কাম সুখ লাভ করতে হবে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট একটি রূপে, সেটা ব্যক্তিগত স্বভাবের হবে না। তার কাম নিয়তির আছে দুটি অপরিহার্য্য পরিণতি। প্রথমতঃ বিবাহবহির্ভূত কোনো যৌন কর্মকান্ডের অধিকার তার নেই; যৌনসঙ্গম এভাবে হয়ে ওঠে একটি সংস্থা, সমাজের স্বার্থের কাছে গৌণ হয়ে ওঠে দু’টি লিঙ্গেরই কামনা ও পরিতৃপ্তি; তবে কর্মী ও নাগরিক হিসেবে পুরুষ যেহেতু সর্বজনীনতার দিকে প্রসারিত, তাই সে বিয়ের আগে ও বিয়ের বাহিরে উপভোগ করতে পারে আকষ্মিক প্রমোদ। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে পুরুষ-প্রথায় এ বিরোধীমূলক কর্মকান্ডের প্রতিবাদ রাধা শুরু করেন যেখানেই নারীমুক্তির প্রথম সোপান বলে অযৌক্তিক মনে হবে না।
যৌনতা সম্পর্কিত নারীবাদ যেসব তাত্ত্বিকের তত্ত্ব বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সেগুলো প্রধানতঃ দু’টি অংশে বিভাজন করা যায় -
ক. নারীবাদী যৌনতা- যা দিয়ে বিশেষ করে আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেহ হয়ে উঠে ভোগ্য বস্তু; বাজার যৌন কামনাকে নিয়ন্ত্রন করে। এদুয়ের বিরুদ্ধে লড়ে গেছে রাই বিনোদিনী চিরন্তনভাবে।
খ. মাতৃত্ব বিষয়ক একমাত্র সামাজিক ও প্রাকৃতিক সত্য। শুরু হতেই ব্যাখোফোনের মতো নৃবিজ্ঞানীরা মাতৃত্ব কল্পনা করেছিলেন। এ সকল নৃবিজ্ঞানীদের কাজে নিরিখেই এঙ্গেলস (২০১৪/১১ পুনঃমুদ্রন) পিতৃতান্ত্রিকতার আবির্ভাবকে বলেছিলেন নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয় হিসেবে যার কারনে রাধার পুনরৎপাদনের বিবরণ পাওয়া যায়না। এ পরাজয়ে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য বিস্তার করে যৌনতাকে রেখেছে দাসত্বশৃংখলে। রাধা এখানেই নারীবাদী হিসাবে অনন্য আজোও এ ধারার অগ্রপথিক। । ফলে প্রকৃত নারীবাদ সামনে আনতে হলে এর সামাজিক রূপটি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন যা শুরু করেছিলেন রাধা। রাধা মেয়েদের শরীর এবং যৌনতার ওপরে পুরুষের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যে দৃঢ় প্রতিবাদী উচ্চারণ করেছিলেন তা নারীবাদ বিনির্মাণের বিকল্প আছে বলে আপাততঃ মনে হয় না।

উপসংহারঃ একটি আলু থালু অবস্থা

আমাদের মতো অগ্রসর সমাজ ব্যবস্থায় যৌন ও নারী সম্পর্কিত আলোচনা বাতুলতামাত্র এমনকি জ্ঞান জগতের শাখা-প্রশাখায়ও। অথচ এ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে যৌনরোগ প্রকোপ বৃদ্ধির পাশাপাশি ফি বছর সন্তান পুনরৎপাদন আমাদের জনসংখ্যা ও সামাজিক সমস্যার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করেছে বহুগুণে ও বহুবিধভাবে। যাই হোক অঙ্গ কিংবা প্রজনন বা পুনরৎপাদন অথবা প্রেম-পরকীয়া সংক্রান্ত বিষয়ে উপসংহার টানা আমার জন্য মন্দোদরির ন্যায় অবস্থা। গল্পটি বলা যেতেই পারে-ত্রেতা যুগে রাম-রাবনের যুদ্ধে নিহত রাবনের স্ত্রী যখন স্বামী মৃত্যুর খবর পেলেন। তখন কাঁদতে কাঁদতে অন্দরমহল হতে রাজ সভায় আসলেন। অতিমাত্রায় বিলাপে, তার অশ্রু জলে কেবল মুখমন্ডলই ভাসেনি বরং বুক চাপড়ানোর ফলে তার চুল হয়ে গেল আলু- থালু অবস্থা উদ্ভ্রান্ত পথিক। যেন নিয়তির পথ হারিয়েছে। যদিও রাজ্য জয়ের পর রাম, বিভীষণকে রাজা বানালে, মন্দোদরি অর্থ্যাৎ দেবর-বৌদির বিয়ে দেন। (পাঠক না, ঐরকম সম্পর্ক তাদের মাঝে ছিলোনা)। প্রসঙ্গটি মন্দোদরির নয়, তাই রাই এর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যদি নারীটি প্রচলিত নিয়মের অনুগত হয়, তাহলে সে গ্রহণ করবে সতর্ক ও কেতাদুরস্ত ব্যক্তিত্ব। অথবা যদি নিয়ম ভাঙ্গার অগ্রযাত্রী হয়, পরিচিতি করে তোলে নিজেকে রহস্যময়ী, অকপট, উচ্ছ্বল, বেশ সাহসী, ইত্যাদি-ইত্যাদি। যদিও বলা হয় রাধিকা- একটি বিমূর্ত এবং হ্লাদিনী শক্তির প্রতীক। কিন্তু আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবিও বটে। যে ছবিটি আমরা দেখি প্রতিনিয়ত চলতে, ফিরতে। এই চলা-ফেরার মধ্যে দিয়ে যখন বিবাহ নামক সামাজিক সংস্থাটির বিবর্তনীয় রূপ এক পত্নী বিবাহ। এই এক পত্নী বিবাহ প্রথায় ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-দুইটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক চরিত্র দেখতে পান। প্রথমতঃ স্ত্রীর প্রেমিক, দ্বিতীয়তঃ ব্যভিচারী স্ত্রীর স্বামী। এক পত্নীক বিয়ে ও বেশ্যাবৃত্তির সাথে, ব্যভিচার হয়ে ওঠে একটি অবধারিত সামাজিক সংস্থা, নিষিদ্ধ, কঠোর ভাবে দন্ডিত কিন্তু দমন অসম্ভব। কারন-বেভোয়ার উল্লেখ করেন (২০১২:২৯৬)-যদি দাম্পত্য শৃঙ্গার স্ত্রীটির ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির না ঘটিয়ে জাগিয়ে তোলে তার ঔৎসুক্য, তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে সে তার পাঠ

সমাপ্ত করবে অন্য কোন শয্যায় ভিন্ন কোন উপায়ে। তাছাড়াও পরিস্থিতি ও প্রথা অনুসারে এর ভিন্নমাত্রা, ও ভিন্ন কারনও পাওয়া যায়। তবে কারনই যাই হোক আমাদের সমাজে যেখানে টিকে আছে পিতৃতান্ত্রিক প্রথা, ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, তাই বৈবাহিক অবিশ্বস্ততা আজো স্বামীর থেকে স্ত্রীর জন্যে অনেক বেশী, লজ্জার,কষ্টের কিংবা অপরাধের। রাধিকা একটি সম্পর্ককে উপস্থাপন করে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন? কারণ রাধা যৌনক্রিয়াকে কোনো ট্যাবুতে আটকে রাখতে চাননি, যৌন ট্যাবুই নারী মুক্তির ক্ষেত্রে একটি ঔদাসীন্য যে তৈরী করে তা বিদ্যাজগতের আলোচনায় প্রমাণিত। অথচ আমরা বেমালুম ভুলে যাই নারী মুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় কামের স্তরের স্বাধীনতা। এ স্তরে বেভোয়ার (২০১২:৩৩৯) মনে করেন যে, যৌনতার ব্যতিক্রম করে নারী তার প্রতিবাদের একটি দিক সমাজের চোখে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কেননা,নারীর আচরণের বহু দিক আছে। যেগুলোকে আমরা প্রতিবাদের এক একটি রূপ হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে বেভোয়ার উল্লেখ করেছেন নারী প্রায়ই তার স্বামীর সঙ্গেঁ প্রতারণা করে প্রকাশ্যে অবাধ্যতা দেখিয়ে এবং তা সে করে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই। আয়ান ঘোষের বাধ্যবাধকতা না মেনে চলতে চায়নি রাধা, তাই কৃষ্ণের সাথে সম্পর্ক তো ছিন্ন করেনি বরং হয়ে উঠেছে আরো প্রতিবাদমুখর, উন্মোচন করেছেন দাম্পত্য জীবনের নানা ফিরিস্তির কিস্তি। রাধার সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে ছিল শ্যামের প্রতি ভালবাসা। আর তাইতো, সেই পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে, ভিতর-বাহিরের প্রবল অনুপস্থিতিই রাধার অঙ্গেঁ আগুন জ্বলে দমকে দমকে যা সে বলে সহাস্যরসে এক প্রতিবাদের কন্ঠ দিয়ে; যা আজকালকার নারীমুক্তির জন্য বেজায় মানানসই। কালার অনুপস্থিতি বা পলায়ন আপনি যাই বলুন- রাধা তা বুঝতে পারেনা সঙ্গত কারনেই। পুরুষের বিশ্বকে, নারী উপলব্ধি করতে পারেনা বলে বোদ্ধা মহল মনে করেন, কেননা তাদের অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করতে শেখায় না। ফলে, প্রবঞ্চনা ও প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে রাধার ন্যায় নারী, পুরুষের শিকার হয় যৌনতার কারনেই। নারী তার সত্তা দিয়ে যে অভিজ্ঞতা যাপন করে, সেখানে পুরুষ হয়ে উঠে অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়; আর ঐ খেলার মাঠে

নারী বরাবরই কুপোকাত। না পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট খেলার ছক বা উপকরণ থাক বা না থাক, সমাজের চোখে সমস্যা হয় না। কারন তার আছে রাষ্ট্রীয় আয়োজনে জমজমাট আসর, কিন্তু নারীর জন্য যতই যৌক্তিক কারণ থাকুক-সে ভরে থাকবে নির্দিষ্টতাবাদ এ যা ঐ ঐতিহাসিকও বটে। যাপিত জীবনে এরকম একটি ধর্মীয় গল্প পাওয়া যায়-পুরুষ ধর্মীয় বিধান মেনে চললে পর জগতে আঠারোটি সুন্দরী নারী পাবে সেবাদাসী হিসেবে। কিন্তু ঐ একই ধর্মীয় বিধান প্রতিপালন করার কারনে নারী পাবে কেবল তার স্বামীকে। অর্থ্যাৎ-মৃত্যু পরবর্তী যুগে তাকে ঊনিশ নারীর সাথে সংসার করতে হবে। ধর্মীয় এ বিধানের বিতর্ক এড়িয়ে বলা যায় নারী তার সীমাবদ্ধতার মাঝে জড়িয়ে আছে আষ্টেপৃষ্টে এবং রাধার প্রতিবাদী আচরণ এ ক্ষেত্রে মোক্ষম অস্ত্র নয় কি?
মনে হতে পারে খাপছাড়া কিংবা অপ্রাসঙ্গিকভাবে নারীবাদ ও যৌন অঙ্গের বর্ণনা কিন্তু যে অঙ্গের জ্বলুনি দিয়ে শুরু তার শেষ জানা ও জানানোটা লেখার দায় মনে করে সংযোজন করেছি রাষ্ট্র ও নারীবাদ সম্পর্কিত আলোচনাগুলো। যৌনতার জন্য রাষ্ট্রের দায় আছে (পরিমল: ২০০৫)। এ দায়ের অস্বীকার বা স্বীকার যাই হোক না কেন সর্ন্তপনে না হাটঁলে বিপর্যয় আনে তুমুলভাবে। সমূলে বিনাশ হোক সমাজ বিধ্বংসের সকল বীজ, সম্প্রসারিত এমন ভাবনা থেকেই আলোচনার দ্বার উন্মোচনই এ লেখার উদ্দেশ্যও বটে।

□□□□□□□ □□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□

১. আজাদ, হুমায়ুন (২০১১.৩য় মুদ্রন) – নারী , আগামী প্রকাশনী , ঢাকা। নারীবাদ এবং যৌনাঙ্গের বর্ণনা মূলতঃ আজাদ (২০১১) ও পৃথ্বীরাজের (১৪০৭) গ্রণ্থ হতে নেওয়া হয়েছে এখান এসবের বর্ণনা অতুলনীয় এবং প্রাঞ্জল বলে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

২. আহমেদ, শামীম (২০২০)- মহাভারতের যৌনতা , কবি প্রকাশনী , ঢাকা।

৩. কবীর, বিলু (২০১৮) – বাঙ্গালির কুসংস্কার ও লোক -বিশ্বাস , জয়তী, ঢাকা।

৪. কবীর, বিলু (২০১৪)- ‘অশ্লীল ’ লোক ছড়ায় সমাজ চিত্র , গতিধারা , ঢাকা।

৫. চৌধুরী , নীরদ চন্দ্র (১৪২৩ বঙ্গাব্দ) - বাঙ্গালী জীবনে রমনী ,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , কোলকাতা, ভারত।

৬. চৌধুরী , নীরদ চন্দ্র (১৪২৩ বঙ্গাব্দ ,৭ম মুদ্রন) - আত্মঘাতি বাঙ্গালী ,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , কোলকাতা, ভারত।

৭. চক্রবর্তী , সুধীর (সম্পাদিত :২০১০) - যৌনতা ও সংস্কৃতি , নবযুগ প্রকাশনী , ঢাকা

৮. চট্টোপাধ্যায় , শরৎ -নারীর মূল্য , কথা প্রকাশ , ঢাকা কর্তৃক পুন : প্রকাশিত ২০০৮।

৯. চৌধুরী , মানস (২০২০) - দৃশ্যগত নৃবিজ্ঞানঃ দৃশ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক , ম্যাজিক লণ্ঠন প্রকাশন , রাজশাহী।

১০.চৌধুরী , মানস (২০০০)-সোনা বন্ধুর পিরীতি এবং ভালোবাসার সুশীল ডিসকোর্স ,সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান , জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় , সাভার।

১১. নিউটন, সেলিম রেজা (সম্পাদিত :২০১৫) -অভ্যাসের অন্ধকার , আগামী প্রকাশনী , ঢাকা।

১২. রায়, পরিমল কুমার (২০০৫)–বিশ্বদ্যিালয়ে মাস্টার্সে উচ্চমার্গীয় পতিতা বা কলগার্ল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে রাস্ট্র ও যৌনতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। *(Class Strewed Prostitution : An anthropological exploration in frontier city of Bangladesh; Dept. of Anthropology , SUST, Sylhet)*

১৩.বেভোয়ার, সিমোন দ্যা (১৯৪৯)- দ্বিতীয় লিঙ্গ , আগামী প্রকাশনী , ঢাকা। অনুবাদ হুমায়ুন আজাদ (২০০১)।

১৪. বর্মন , রেবতী (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)- সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ , কথা প্রকাশ , ঢাকা।

১৫. বসাক, ড: রাধা গোবিন্দ (১৯৫০:বঙ্গানুবাদকৃত)- কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র (অখন্ড সংস্করণ), ভারত।

১৬. বসু , পূরবী (২০১৩) – প্রাচ্যে পুরাতন নারী ,অবসর প্রকাশনা সংস্থা , ঢাকা।

১৭. মঈন, রাবেয়া (১৯৮৯)- বক্ষ বন্দনা , জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র , ঢাকা।

১৮. রায়, নয়ন ও অনন্যা , অভয়া (সম্পাদিত ১৪২৬ বঙ্গাব্দ)- দুই বাংলার পরকীয়া (১ম খণ্ড), আকাশ. ঢাকা।

১৯. সেন, পৃথ্বীরাজ (সংকলিত: ১৪০৭ বঙ্গাব্দ) -বিশ্বের কামসূত্র সমগ্র , কামিনী প্রকাশালয় , কলিকাতা।
২০.হক, সৈয়দ শামসুল (২০১৯)- কানার হাট বাজার , ঐতিহ্য , ঢাকা।